অঙ্কুর বর
মাটি
BIVA

মড়ি

অঙ্কুর বর

বিভা পাবলিকেশন

MORI
by ANKUR BAR
Published by Biva Publication
1K, Uday, Rajarhat Residency,
Roypara, Hatiara, Kolkata 700157
Phone : 9434343446
e-mail : biva.publications@gmail.com
follow us : facebook.com/BivaPublication
Website : www.bivapublication.com
Rs. 199.00

ISBN: 978-93-90890-38-5

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০২১, অগ্রহায়ন ১৪২৮

প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ: অভিব্রত সরকার

সম্পাদনা: সুমঙ্গল পণ্ডিত

১৯৯ টাকা

প্রকাশক: বিভা পাবলিকেশন

পরিবেশক

দে বুক স্টোর (দীপুদা),
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভারতী বুক স্টল,
৬বি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০০৯

। উ । ৎ । স । র্গ

সেই সব পাঠক বন্ধুদের, যারা শুধুমাত্র আমার নামের ওপর ভরসা করেই আমার বই কেনেন। এই বিশ্বাস থেকে, যে বইটি ভালো হবে।

ভূমিকা

আচ্ছা তাহলে মড়ি'র ভূমিকা লিখতে হবে। তাই তো?

যাই, বলুন না কেন? এই ভূমিকা লেখাটা বড্ড চাপের। প্রত্যেকবার, এই জায়গায় এসে কেমন যেন হোঁচট খেতে হয়। বারবার ঝামেলায় পড়তে হয় ভূমিকা লিখতে গিয়ে। তো যাইহোক, লিখতে হবেই যখন আর দেরি করে লাভ কী?

তা প্রথমেই শুরু করা যাক, মড়ি নিয়ে। মড়ি কী? সুন্দরবন এলাকায়, বাঘ কোন মানুষ শিকার করলে, তার পুরোটা সে একেবারে খেয়ে শেষ করতে পারে না। অর্ধেক অংশ খেয়ে তার বাকিটা সে রেখে দিয়ে যায়, পরে এসে খাবে বলে। এই আধ-খাওয়া মৃতদেহই মড়ি।

ব্যাস, সংগ্রহে থাকা বলতে শুধু এইটুকু মাত্র রসদ। এবার সুন্দরবন এলাকার এই কনসেপ্টটিকে উত্তর দিনাজপুরের একটি মফস্‌সলে পুরোপুরি ভৌতিক কনসেপ্টে কীভাবে ঢালা হল? আর বিস্তর কী কী জিনিস যোগ-বিয়োগ করে, কীভাবে এই ভূতুড়ে উপন্যাসটি দাঁড় করানো হল, সেটা জানতে হলে, অবশ্যই বইটি একবার পড়ে দেখবার অনুরোধ করা হল।

আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভৌতিক আবহের সঙ্গে যদি একটা রহস্যের গন্ধ মিশে থাকে কোনো উপন্যাসে, তাহলে তা পাঠক উপাদেয় খাদ্য হয়। 'দহনক্ষুধা' থেকে শুরু করে 'মড়ি'র এই পথ-পরিক্রমায় আমি সেই ধারণাকেই পাথেয় করে এগিয়েছি। আশা করি আপনারা নিরাশ হবেন না।

'মড়ি' আমার লেখা তৃতীয় বই। কিন্তু বাকি দুটি বই-এর থেকে এই বইটি আমার কাছে একটু অন্যরকম তার কারণ, এবারের বইটি পুরোপুরি স্বতন্ত্র একটি কনসেপ্টে ভর করে লেখা হয়েছে, যার পূর্ববর্তী কোনও সূত্রের নুন্যতম

অংশ আমার মাথায় ছিল না। নিজে কতটা পারবো, সে বিষয়ে আমি নিজেই যথেষ্ট সন্দিহান ছিলাম। কিন্তু সুমঙ্গল পণ্ডিতদা ছিলেন না। উনিই ভরসা করে বলেছিলেন, তুই লিখলে সম্পূর্ণ নতুন কিছু লিখবি। এই বিশ্বাসটা উনি রেখেছিলেন বলেই, মড়ি কোথাও গিয়ে আজ ছাপার অক্ষরে। তাকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা নেই। রুদ্র সাহা, মড়ি লেখা শুরু হয়েছিল তোমার বাড়িতে বসেই। এই লেখা কমপ্লিট করাবার জন্য, তুমি যে এফোর্টটা দিয়েছিলে, তার জন্য ভালোবাসা। আর যে দুজনের নাম না করলে, পাপ হবে, সেটা আমার মা আর বাবা। ওনারা আমার লেখার পরিবেশটা এত সুন্দর আর নীরব করে তোলেন যে, লেখাগুলো কোথাও গিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে। আমি সন্তান হিসেবে নয় লেখক হিসেবে তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ (যদিও একটানা অনেকক্ষণ বসে বসে লিখলে, মায়ের বকুনিও শুনতে হয়)। ব্যস, এবারের মতো এতটুকুই। মড়ি পড়ুন। পড়ান। আর বলুন,

মড়ি মড়ি মড়ি
মড়ার মাথায় নড়ি।

অঙ্কুর বর
কলকাতা,
১২ নভেম্বর, ২০২১

সূচিপত্র

মড়ি
মড়ি
(প্রথম খণ্ড)
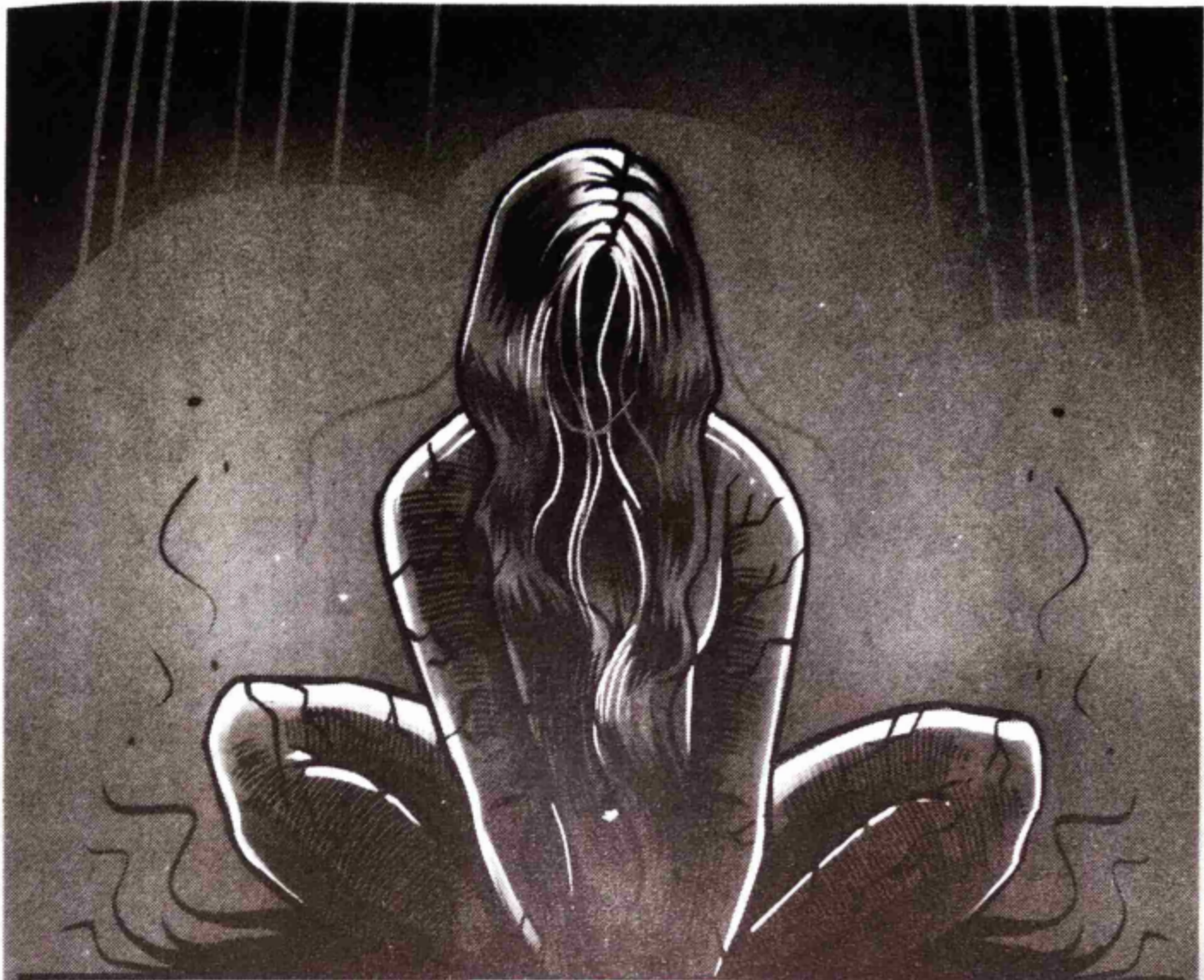
(১)

মড়িক্ষণ

"তাহলে কী বলছেন মুখুজ্জে মশাই। এবার মড়া তুলে বের হই নাকি?"

উঠোনের দক্ষিণদিকে এককোণে জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কীর্তনদলের লোকজন। এ ছাড়াও পাঁচ গ্রামের মাতব্বররা আর পাড়ার লোকজন তো রয়েছেই। সরকারদের বাড়ির উঠোনটা এই মুহূর্তে পুরো গিজগিজ করছে লোকজনের ভিড়ে। পুরো ভিড় থেকে তফাতে দাঁড়িয়ে ঘরেরই একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে কান খোঁচাচ্ছিল সনাতন বাউড়ি। সেখান থেকেই প্রায় চিৎকার করে, কথাটা গ্রামপ্রধান তিরোধান মুখোপাধ্যায়ের দিকে ছুড়ে দিল সে। উঠোনেরই একপাশে একটা চৌকি পাতা। তাতেই আরও দু-চারজন এলাকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সঙ্গে বসে রয়েছেন মুখুজ্জে মশাই। অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ আগে। উঠোনের দুইপাশে দুটো হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বালানো হয়েছে। সেই উজ্জ্বল আলোই এই মুহূর্তে উঠোনের অন্ধকারকে দূর করছে। তিরোধান মুখুজ্জে এতক্ষণ নিজের পায়ের বুড়ো আঙুলের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে ছিলেন। সনাতনের প্রশ্নে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। ঘরের ভেতর থেকে রামকৃষ্ণর স্ত্রী-র কান্নার মৃদু স্বর এখনও ভেসে আসছে। সনাতনের হাবেভাবে এক ধরনের ঔদ্ধত্য রয়েছে। খানিকটা নিয়ম না মেনে চলতে চাওয়ার ঔদ্ধত্য। খানিকটা নেতাসুলভ ঔদ্ধত্য।

তিরোধানবাবু তার কথার উত্তর না দিয়ে, সরাসরি তাকালেন উঠোনের ডানদিকে। যেখানে একটি কাঁচা বাঁশের খাটুলির ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে রামকৃষ্ণ সরকারের মৃতদেহ। সেই খাটুলিরই একপাশে একতাল মাটির ওপরে একগোছা জ্বলন্ত ধূপ কখন গেঁথে দেওয়া হয়েছিল, তারই ভুরভুরে সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। সৎকারের সমস্ত সামগ্রী একসঙ্গে জড়ো করে রাখা

হয়েছে শবদেহ হতে খানিকটা তফাতে। শুকনো কাঠ, বাঁশ, তালপাতা, কেরোসিন, গোবরজলের হাঁড়ি, কড়ি ও তামার পয়সা মেশানো খই, মাটির হাঁড়ি, আরও কত কী! শক্তি পাত্র এলাকার ডোম। সব কিছু অনিশ্চিত জেনেও শেষবারের মতো জিনিসপত্রের ওপর চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে সে।

তিরোধান মুখুজ্জের পাশে বসে ছিলেন এলাকারই প্রবীণ মুরুব্বি কৃষ্ণপ্রসাদ বাড়ুই। কাঁচুমাচু মুখ করে বলে উঠলেন, ‘‘ভাই তিরু, আমার মনে হয়, ছোঁড়া ঠিক বলছে। এবার মড়া তোলা উচিত। অনেকক্ষণই তো হল প্রায়। এখনও কিছুই শোনা...”

‘‘কৃষ্ণপক্ষের মৃতদেহ কেষ্টদা...। তুমি ভুলে যাচ্ছ, এই সময় কী ক্ষণ হয়। এই সময় কেউ মরলে তাকে কী করতে হয়?”

তিরোধান মুখুজ্জে কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই সনাতন বাউড়ি বলে উঠল, ‘‘কিন্তু তার জন্য তো অনেক নিয়ম আছে। সেসবের তো কিছুই হচ্ছে না। আপনি কী করে বলছেন এ মড়া...”

কথা বলতে বলতেই আচমকা থেমে একটা ঢোঁক গিলল সনাতন, ‘‘এ মড়া, মড়িক্ষণে রয়েছে।”

‘‘কৃষ্ণপক্ষের মধ্যাহ্নের পর কেউ মরলে সেই মড়া মড়িক্ষণে পড়ে। এমনটাই নিয়ম।” মুখুজ্জেবাবু তাঁর শেষ খুঁটিটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছেন।

‘‘কিন্তু মুখুজ্জে মশাই, পশ্চিমের জঙ্গল থেকে কোনও শব্দ এল না। মড়ার শরীরে মড়িক্ষণের ছাপ ফুটে উঠল না। সেসব না হলে কেমন করেই বা...” ভিড়ের মধ্যে থেকে কথাটা একজন বলে উঠতেই, চুপ করে গেলেন তিরোধান মুখুজ্জে। এই জিনিসটাই তো তাঁকে বারবার ভাবনায় ফেলছে। কেন? কেন? পশ্চিমের জঙ্গল থেকে শব্দ ভেসে আসছে না কেন? কেনই বা মড়ার গায়ে মড়ির ছাপ ফুটে উঠছে না? তাহলে কি তিনি সত্যিই ভুল? কিন্তু এমন কী করে হয়? তাঁর এতদিনের অভিজ্ঞতা মিথ্যা হয়ে যায় কেমন করে?

তিরোধান মুখোপাধ্যায় একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন, ‘‘বেশ, তাহলে তোমাদের

কথাই রাখা হল। আমরা রামকৃষ্ণের দেহ সৎকার করব। কিন্তু পরে যদি বুঝতে পারো আমি ঠিক ছিলাম, তখন কিন্তু বড় বিপদ...”

“এতক্ষণেও যখন কিছু হল না, তখন আর এসব ভাবার দরকার নেই, মুখুজ্জে মশাই। বরং চটপট এইদিকের সৎকারের কাজটা সেরে নিই। ওদিকে দেখতে দেখতে রাত ঘনিয়ে এল।” সনাতন বাউড়ি একটু থেমে কীর্তনের দলের উদ্দেশে চিৎকার করে উঠল, “কই গো। হরিনাম ধরো। অনেকক্ষণ তো বসে রইলে। এই, কে কোথায় আছিস... তোল তোল, মড়া তোল। এই বরেন, এই নবীন, আয় আয়, দেরি করিস না বাপ আমার।”

প্রবল উৎসাহে সনাতন ঝাঁপিয়ে পড়ল কাজে। মুখুজ্জে মশাই গ্রামের মাথা। চাপ দিয়েই হোক, বা অন্য কিছুভাবে তার সিদ্ধান্তকে ছাপিয়ে সকলে যে সনাতনের মতামতকে গ্রহণ করেছে—এই বা কম কী? কথাটা ভাবতে ভাবতেই ঠোঁটের কোণে একটা মুচকি হাসি খেলে গেল তার। এইভাবেই ধীরে ধীরে একদিন তিরোধান মুখোপাধ্যায়ের অবস্থানকেও ছাপিয়ে সে এই গ্রামের মাথা হয়ে উঠবে। তার জন্য কম কাঠখড় তো সে পোড়াচ্ছে না। তিরোধানবাবু অসহায় দৃষ্টিতে দেখলেন, সনাতনের নির্দেশ মেনে সকলেই ধীরে ধীরে রামকৃষ্ণর শবযাত্রার তোড়জোড় শুরু করে দিল। এতগুলো মানুষের হাঁকডাক, অস্থির চলাচল, কীর্তনদলের হরিনাম, ঘরের ভেতর থেকে রামকৃষ্ণের স্ত্রী-কন্যার ক্ষীণ কান্না—সেসব আচমকাই যেন বড় শব্দহীন ঠেকতে লাগল তিরোধান মুখুজ্জের কাছে, কারণ ততক্ষণে এক ভয়ংকর ঝড় উঠছে তাঁর মনের গহিনে।

তাঁর বারবার মনে হচ্ছে, কিছু একটা হতে চলেছে। ভয়ংকর কিছু। এক ভয়ংকরী ক্ষুধার্ত পেটে ওঁত পেতে বসে রয়েছে, সব কিছু গিলে খাওয়ার জন্য। আর সে অপেক্ষা করছে নির্দিষ্ট মুহূর্তের।

* * * * * * * * * * *

(২)

আউধুনির ডাঙা

জঙ্গলটা আয়তনে খুব একটা বড় নয়। আবার যে খুব ঘনও, তেমনটাও নয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে যত এগিয়ে যাওয়া যায়, তত ঘনত্ব বাড়তে থাকে জঙ্গলের। গাছেরা সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে আঁটসাঁট হয়ে। মাথার ওপর পাতার ছাউনি এমনভাবে আকাশ ঘিরে রাখে যে, সূর্যের আলোই প্রবেশ করতে পারে না জঙ্গলের অনেক জায়গায়। হিংস্র জন্তু তেমন নেই, তবে মাঝে মাঝে ভামবেড়াল, শেয়াল আর বিষাক্ত সাপের দেখা মেলে। শোনা যাচ্ছে, জঙ্গলের পূর্বদিক ধরে সদরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য নতুন সড়কের প্রস্তাবনা চলছে সরকারি দপ্তরে। এমনিতে এই জঙ্গলে মানুষের আনাগোনা একেবারেই নেই বললেই চলে। প্রথমত, জঙ্গলটি লোকালয় হতে অনেকটা তফাতে। আর দ্বিতীয়ত, আর সম্ভবত প্রধানত, এই জঙ্গলে নাকি অমুয়োরা থাকে। অমুয়ো—যাদের মুখ দেখতে নেই। যাদের মুখ দেখলে নাকি জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ।

সূর্য অনেকক্ষণ ডুবেছে। অন্ধকার জঙ্গলে নেমে এসেছে সন্ধ্যার কালো ছায়া। ঘরে ফেরা পাখিদের কিচিরমিচির অনেকক্ষণ আগেই থেমেছে। এই মুহূর্তে চারদিকে শব্দ বলতে ঝিঁঝিপোকার নিরবচ্ছিন্ন ডাক, আর মাঝে মাঝে শেয়ালের হুক্কাহুয়া। ঠিক এমন সময় শুকনো পাতা আর ডালপালার ওপর দিয়ে হেঁটে আসার মতো একটা বিসদৃশ শব্দে এই মন্থর প্রকৃতি কেমন যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠল। অন্ধকার জঙ্গলের ভেতর থেকে মশাল হাতে হেঁটে আসছে কালো পোশাক-পরা দুটি দেহ। পরনে কালো খাটো ধুতি, গায়ে কালো চাদর। কোমরের কাপড়ে গোঁজা, কাটারি গোছের কোনও অস্ত্র। পোশাকের জায়গায় জায়গায় ছেঁড়াফাটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে বহু ব্যবহারে এ পোশাক মলিন। দুজনেই পুরুষ। একজন সামনে, একজন পিছনে। পিছনের জনের হাতেই ধরা মশালের আলো। একজন একটু বেশি বয়স্ক। মাথায় মুখে

কাঁচাপাকা দাড়িগোঁফের জটাজূট। হাতে ধরা লাঠি সামনের দিকে নুয়ে-পড়া শরীরের ভার ধরে রেখেছে। কিন্তু তারপরেও বয়স্ক লোকটি অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এগিয়ে চলছে সামনের দিকে। ওর পিছনে যে রয়েছে, তার কম বয়স হলেও সে যেন সামনের লোকটির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পেরে উঠছে না।

"বুড়ো, আস্তে হাঁটো। আস্তে হাঁটো। এরকম করছ কেন? পড়ে যাবে তো।" যুবকটি শেষে থাকতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল পিছন থেকে। এই বয়সে পড়ে গিয়ে একটা বিপদ বাধালে ভয়ংকর কিছু একটা হয়ে যাবে।

কিন্তু সামনের বয়স্ক লোকটি গা করল না। সে একই গতিতে সামনের দিকে এগোতে লাগল।

"সন্ধ্যা থেকে তিনবার চলে এলে এই জায়গায়। এসে কী লাভ হচ্ছে শুনি? ও ঠাকুর, এত অস্থির কেন হয়ে আছ গো?" পিছনের ছেলেটির কণ্ঠস্বর শুনলেই বোঝা যায়, সে ভয় পাচ্ছে অজানা কিছু নিয়ে।

সামনের বয়স্ক লোকটি তার চলার গতি না কমিয়েই বলে উঠল, "এমনটা হওয়ার কথা নয় রে। এমনটা হওয়ার কথা নয়...। যে মরেছে, সে মড়িক্ষণে মরেছে, আমি নিশ্চিত। কিন্তু মড়িক্ষণ নির্ধারণ করতে পারছি না যে।"

"আউধুনি সাড় না দিলে, মড়িক্ষণ নির্ধারণ করবে কেমন করে? সন্ধ্যা থেকে তিনবার হল এই নিয়ে। এ জায়গা কি ভালো? তায় কৃষ্ণপক্ষ। নিশ্চয় এ মড়িক্ষণ নয়। না হলে তো সাড় মিলত।"

ছেলেটির প্রশ্ন শুনে আচমকাই থমকে গেলেন বয়স্ক লোকটি। তারপর ছেলেটির দিকে পিছন ফিরে বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "সেটাই তো ভয় রে... সাড় কেন মিলবে না... সাড় কেন মিলবে না? এমনটা তো হয় না। এ কি এমনি এমনি নাকি এসবের পিছনে রয়েছে তার চক্রান্ত?"

"চক্রান্ত?"

"হ্যাঁ, চক্রান্ত। তুই জানিস না? দেখিসনি এর আগে? সে সব করতে পারে। সব।" কাঁপা-কাঁপা স্বরে কথাটা শেষ করেই কী যেন একটা মনে পড়ল, এমন ভঙ্গিতে আচমকা বলে উঠলেন, "আয়, আয়, দেরি করিসনি। খুব বড় কিছু

হতে চলেছে। আউধুনির সাড়া পেতেই হবে। মড়িক্ষণে একবার মড়া ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে। সর্বনাশ...”

কথাটা বলেই লোকটি আবার দ্রুতগতিতে সামনে এগিয়ে গেল। পিছনের ছেলেটি মশাল হাতে দ্রুতগতিতে তাঁর পিছু নিল। ছেলেটি নিজেও ভয় পেয়েছে। সত্যিই কি একটা ভয়ংকর কিছু হতে চলেছে?

দেখতে দেখতেই ওরা জঙ্গলের অনেকটা পশ্চিমদিকে চলে এল। এখানে গাছেরা বেশ ঘন। কষ্ট করে সামনে এগোতে হয়। লতাগুল্ম, বড় বড় ঘাসের আড়ালে বিষাক্ত সাপেরা কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে। সাবধানে পা না ফেললে ছোবল খাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু সামনের লোকটির যেন সেসবে ভ্রূক্ষেপ নেই। আউধুনির সাড় পাওয়ার জন্য তিনি যেন তাঁর গন্তব্যের দিকে দ্রুতপায়ে এগোচ্ছেন। আচমকা পিছনের কমবয়সি ছেলেটির মনে হল, হঠাৎ করে চারদিক কেমন যেন থম মেরে গিয়েছে। গুমোট হয়ে উঠছে বাতাস। একটা ভারী কিছু যেন বুকের ওপর চেপে বসছে ধীরে ধীরে।

চলতে চলতেই বয়স্ক লোকটি আচমকা থমকে দাঁড়ালেন পথের মাঝে। জমিটা এরপর কিছুটা ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। ওদের এই ঢাল বরাবরই এগোতে হবে। মশালের হলুদ আলোয় দেখা যাচ্ছে, কতকগুলো গাছ গা ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে একটা পাঁচিলের আকৃতি গঠন করে ওদের পথ অবরুদ্ধ করে ফেলেছে। যেন, ঠিক ওপারে কী রয়েছে তা দেখতে দিতে চায় না এই গাছেরা। বুড়ো লোকটি এক মুহূর্ত সময় চোখ বন্ধ করে বিড়বিড় করে কী যেন একটা বলল, তারপর হাতের লাঠিটা একপাশে ছুড়ে, হাঁটু মুড়ে হামাগুড়ির ভঙ্গিতে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটিও এক মুহূর্ত দেরি না করে বুড়ো মানুষটিকে অনুসরণ করল। প্রথমবার যখন সে বুড়োর সঙ্গে এখানে এসেছিল, তখন প্রবল বিস্ময়ে সে কথাটুকুও বলতে ভুলে গিয়েছিল কয়েকদিন। আজকাল আর হয় না। কয়েকবারই সে এখানে এসেছে, কিন্তু সমস্ত প্রক্রিয়াই তাঁর মুখস্থ। হয়তো খুব একটা দেরি নেই যখন বুড়োর দায়িত্ব সে-ই সামলাবে। কতদিন হল যেন সে এখানে আছে? দিন মনে নেই

ছেলেটির। শুধু মনে আছে, একরাতে কিছু মানুষ এসে তাকে এই বুড়োর কাছে রেখে এসেছিল। তখন সে খুব ছোট। তারপর থেকে সে এখানেই থাকে। এই জঙ্গলেই। বুড়োর সঙ্গে।

দুটো বড় বড় গাছের শিকড়ের নীচ দিয়ে একটা পাতলা শরীর গলে যাওয়ার মতো একটা ফাঁক ছিল। বয়স্ক লোকটি সুনিপুণ অভ্যাসে সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে উলটোদিকে চলে যেতেই, ছেলেটিও সেইদিকে এগিয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে মশালের আলোটাকে সেই ফাঁকের উলটোদিকে ফেলে দিতেই, জায়গাটা কেমন যেন অন্ধকার হয়ে গেল মুহূর্তেই। এবার নিজের শরীরের পালা। দেরি না করে ঝটপট নিজের মাথাটা সেই ফাঁক বরাবর এগিয়ে দেওয়ার জন্য যেই মাথাটা এগিয়েছে সামনের দিকে, ঠিক এমন সময়ই ছেলেটি টের পেল, একটা একটা করে তার ঘাড়ের লোম, যেন আপনা হতেই খাড়া হয়ে যাচ্ছে।

কেউ একজন ঠিক তার কানের পিছনে, ঘাড়ের কাছে গরম নিশ্বাস ফেলছে। কিন্তু একটু আগেও তো কেউ ছিল না এখানে। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে যাবে, সঙ্গে সঙ্গে সামনের দিক থেকে একটা হাত মাথার সামনের দিকের চুল খামচে ধরল, "খবরদার না... খবরদার পিছন ফিরে তাকাবি না।" শিকড়ের ফাঁক গলিয়ে বুড়োটা এক হাতে তার চুল ধরে রেখেছে। "আয়... আয়, ওদিকে না। ভেতরে ঢুকে আয়..."

বুড়োর কথায় কাজ হল, ছেলেটি আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সঙ্গে সঙ্গে মাথাটা গলিয়ে দিল শেকড়ের ফাঁক গলে। তারপর একটু একটু করে পুরো শরীরটা। বুড়োটা তখনও তার মাথার সামনের দিকের চুল খামচে ধরেছে। সেই অবস্থাতেই চুলের ঝুঁটি ধরে ভালো করে ঝাঁকিয়ে বলে উঠলেন প্রচণ্ড রাগে, "কতবার না বলেছি। পিছন ফিরে চাইবি না। জানিস না, পিছন ফিরে চাইলে কী হয়?"

ছেলেটি কাঁচুমাচু মুখে উঠে দাঁড়িয়ে মশালের আলোটা তুলে ধরতেই জায়গাটা ঈষৎ দৃশ্যমান হল।

ঘন জঙ্গলের মাঝে একটা ফাঁকা বৃত্তাকার জায়গা। ঘনসন্নিবিষ্ট হয়ে গাছেরা যেন একটা বৃত্তাকার পাঁচিল তৈরি করে জায়গাটাকে লোকচক্ষুর আড়ালে রাখতে চাইছে। কোনও বিশাল বড় গ্লাসের মাঝবরাবর কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে চারদিকটা যেমন দেখতে লাগে, এ-ও তেমনিই। কিন্তু জায়গাটা একেবারেই কি ফাঁকা? নাহ্। শীতকালে ভোরের দিকে ফাঁকা মাঠের ওপর ঘাসের কাছাকাছি যেমন এক স্বচ্ছ কুয়াশার চাদর পাতা থাকে, ঠিক তেমনই একটা ধোঁয়াশার চাদর ঘিরে রয়েছে জায়গাটিকে। আর সেই কুয়াশার চাদরেরই বুক ফুঁড়ে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে কতকগুলো গাছ। কিন্তু এগুলোকে গাছ বলা যায় না। গাছগুলোর ডালপালা এতই নিপুণ করে ছেঁটে দেওয়া হয়েছে যে, এক লহমায় দেখলে মনে হবে, কেউ যেন জায়গাটা জুড়ে অনেকগুলো বিরাট বপুর খুঁটি পুঁতে দিয়ে গিয়েছে।

বয়স্ক লোকটি ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল গাছগুলোর দিকে। নিপুণ করে ডালপালা-ছাঁটা গাছগুলোর কাণ্ড বরাবর কারা যেন লাল কাপড় পেঁচিয়ে রেখেছে। আর গাছগুলোর ওপরের দিক থেকে লাল কাপড়ের একটা করে পুঁটলি দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জায়গাটা যে সাধারণ কোনও জায়গা নয়, সেটা যে কেউ দেখলেই বলে দিতে পারবে। ঘন অন্ধকার ঢাকা এই জায়গায় দাঁড়িয়ে-থাকা গাছগুলোর দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা আপনা থেকেই অজানা আতঙ্কে ছ্যাঁত করে ওঠে।

"দ্যাখো। দেখলে তো। একটু আগেও যা দেখে গিয়েছিলে, ঠিক তা-ই। আগের মতোই কেউ কোনও সাড়া দিচ্ছে না। তুমিই খালি খালি...।"

ছেলেটি তিরস্কারের ভঙ্গিতে কথাটা বলে উঠতেই বয়স্ক লোকটি বলে উঠল, "সেটাই তো আশ্চর্যের রে! কেউই সাড় দিচ্ছে না। এমনকি ধরিত্তি মা-ও কেমন চুপ করে রয়েছে দেখেছিস? এমনটা তো হওয়ার কথা নয়। আমরা যা দেখছি তা সত্যিই সত্যিই তো? নাকি আমাদের অন্য কিছু দেখানো হচ্ছে?" কথাটা বলতে বলতেই কোঁচড়ের ফাঁক গলে বের করে আনল একটা কালো কালো ছোপ-লাগা ময়লা সাদা কাপড়। ছেলেটি মশালের আলোয়

সেই কাপড় দেখে শিউরে উঠল। এ যে রক্ত-মাখা কাপড়!

"এ তুমি কী করেছ বুড়ো?" ছেলেটি নিজের চোখজোড়াকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছে না। "তু...তুমি গাদিতল থেকে এঁটো তুলে এনেছ? তা-ও এখানে? উপাচারে শুদ্ধ না-করা এঁটো এখানে আনলে কী হয়?"

"আর কোনও উপায় ছিল না রে হারু। এখানে এটা আনতেই হত... না হলে ওকে আটকাতে পারবি না। সে সব্বনাশি খুব বড় কিছু ঘোঁট পাকাচ্ছে...। তাঁর ক্ষমতা তুই চিনিসনে..."

কথাটা বলতে বলতেই হাতের রক্ত-মাখা কাপড়টা ধোঁয়াশা-জড়ানো মাটির ওপর ছুড়ে ফেলে দিতেই, চোখের পলকে কেউ যেন সমস্ত ধোঁয়া শুষে নিল। এবার মাটিটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ছেলেটি ভয়-পাওয়া চোখে তাকিয়ে রয়েছে বয়স্ক লোকটির দিকে। কী করল এটা বুড়ো? এই জায়গায় যে তার কোনও এঁটো আনতে নেই। এ জায়গায় তার এঁটো আনলে নাকি...

সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে-আতঙ্কে একটা চাপা চিৎকার বেরিয়ে এল ছেলেটির গলা ঠেলে। পায়ের নীচের মাটিটা থরথর করে কেঁপে উঠতেই একসঙ্গে অনেকগুলো ঠকঠক শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটি মশালের আলোটা উঁচিয়ে ধরতেই যা দেখা গেল, তাতে করে ছেলেটির মনে হল, তার পেটের ভেতরটা একটু একটু করে খালি হয়ে যাচ্ছে।

গাছের মাথা থেকে ঝুলতে-থাকা কাপড়ের পুঁটুলিগুলো নড়ছে। ভয়ংকরভাবে। আপনা থেকেই। কোনও বাতাস নেই, কেউ নাড়াচ্ছে না। কিন্তু ওগুলো আপনা-আপনিই নড়ছে। যেন কেউ দড়ি ধরে ঝাঁকুনি দিচ্ছে খুব জোরে। আর সেগুলোই গাছের কাণ্ডে ধাক্কা লেগে ঠকঠক করে আওয়াজ হচ্ছে।

"কী বলেছিলাম তোকে? কী বলেছিলাম? এসব ওর চক্রান্ত, সবাই ঘুমিয়ে ছিল। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল সে। এখন এঁটো খাবারের গন্ধে সব ক-টা উঠে পড়েছে।" বুড়োটি পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল দৃশ্যটা দেখেই।

"এরপর? এরপর কী হবে?"

বুড়ো একবার মুচকি হেসে তাকাল ছেলেটির দিকে—"এরপর? আউধুনি বাঁধা হবে।"

কথাটা বলেই বুড়ো কোমরে মোড়া কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটা কাপড়ের থলে বের করে মাটির ওপর উপুড় করে ঢেলে দিতেই পায়ের কাছে ছড়িয়ে পড়ল এক লুথি পাটের দড়ি, দুটো বড় বড় গজ পেরেক, এক পাতা সিঁদুর। বুড়ো মাটির ওপর উবুড় হয়ে বসে নিজের কাজ করতে লাগল দ্রুতহাতে। প্রথমেই সিঁদুরের পাতা থেকে খানিকটা সিঁদুর দু-হাতে ঢেলে সেই পাটের দড়ির ওপর ভালো করে মাখিয়ে দিল। তারপর বাকিটুকু সিঁদুর দুটো বড় বড় গজ পেরেকে ভালো করে মাখিয়ে দড়ির দুটো প্রান্ত ভালো করে গিঁট মেরে দিল পেরেকের মাথায়।

ছেলেটি জানে, এরপর থেকে শুরু করে, আউধুনি না-বাঁধা পর্যন্ত বুড়ো একটাও কথা বলবে না। যা কিছুই হয়ে যাক, একটাও কথা বলবে না।

পায়ের নীচের মাটি এখনও ভয়ংকরভাবে কাঁপছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মাথার ওপরে ঝুলতে-থাকা ঠকঠক শব্দটা আরও তীব্র হচ্ছে। এরই মধ্যে বুড়োটা কাঁপা কাঁপা পায়ে উঠে দাঁড়াল। তার দু-হাতে ধরা দুটো পেরেক, যা একে অপরের সঙ্গে একটা সিঁদুর-মাখানো সুতলি দড়ির সঙ্গে যুক্ত। বুড়োটা ছেলেটিকে ইশারা করে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ভয়ে ছেলেটির গলা শুকিয়ে আসছে। আউধুনি বাঁধা সে জানে। কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতে সে এর আগে পড়েনি। কিন্তু বুড়োর নির্দেশ অমান্য করার ক্ষমতা তার নেই। ওরা এক-একটা গাছের পাশ কাটিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেল। ওদের একটি নির্দিষ্ট গাছের সামনে যেতে হবে, যেখানে ওদের আউধুনি বাঁধতে হবে। দেখতে দেখতেই, বদ্ধভূমির একেবারে শেষ মাথায় এসে ওরা উপস্থিত হল। এখানে অন্ধকার আরও জমাট হয়ে চেপে বসেছে যেন, মশালের হলুদ আলোও এই অন্ধকার যেন দূর করতে পারছে না।

ওদের সামনে এখন একটা একইভাবে ডালপালা-ছাঁটা গাছ কিন্তু অপেক্ষাকৃত সরু। দেখেই মনে হয় গাছটি নবীন। এই গাছেরও সারা গায়ে লাল কাপড়

প্যাঁচানো আর মাথার দিক থেকেও ভেসে আসছে সেই ভয়ংকর ঠকঠক শব্দ। বুড়ো লোকটি দেরি না করে ঝটপট হাতের দুটি পেরেক মুখের সামনে এনে, একদলা থুতু ছিটিয়ে দিল তার ওপর। আর তারপরেই সজোরে দুটো পেরেক গাছের কাণ্ড বরাবর গেঁথে দিতেই, পেরেক দুটো আশ্চর্যজনকভাবে কাণ্ডের অনেকটা গভীরে ঢুকে গেল। পেরেক দুটো গাঁথার সঙ্গে সঙ্গেই সেই জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এল কাঁচা রক্তের লাল ধারা। বুড়ো আর এক মুহূর্তে দেরি না করে, কয়েক পা পিছিয়ে এসে, সেই সিঁদুর-মাখা দড়ি ধরে একটা সজোরে টান মেরেই চিৎকার করে উঠল ভয়ংকরভাবে—

"মড়ি মড়ি মড়ি
মড়ার মাথায় নড়ি
নড়ি চাটে নেউল
বিরান হল দেউল
দেউল ভাঙি দাঁতে
মড়ি আসে রাতে।।
আউধুনির মাঠে
ডোম এসে ডাকে।
ডোমের ডাকে সাড়া
ভাত হয়েছে বাড়া।
ডাকের গলায় হাঁক
কাণ্ড চিরে ফাঁক
রক্ত মাখে ধুলো।
ক্ষণ কী এবার হল?"

চিৎকার করে ছড়াটা শেষ করামাত্রই যা হল, তা নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না।

খুব বিশ্রী আর চাপাস্বরে সামনের গাছ থেকে বেরিয়ে এল একটা স্বর—"হল... হল... হল..."। আর তারপর আচমকাই জায়গাটা জুড়ে এক ভয়ংকর কান্নার রোল উঠল। মনে হচ্ছে, হাজার হাজার নবজাতক শিশু একসঙ্গে কেঁদে উঠছে জায়গাটা জুড়ে। ছেলেটির যেন বোধ লোপ পেয়েছে। আউধুনি বাঁধা সে দেখেছে, কিন্তু এইভাবে সে দেখেনি কখনোই। সেই ভয়ংকর কান্নার রোল, মাটির নীচের কম্পন, মাথার ওপর সেই পুঁটুলির ঠকঠক শব্দ—সব কিছুই যখন তাকে একেবারে বিহ্বল করে দিয়েছে, ঠিক তখনই একটা বজ্রকণ্ঠ তার চেতনা ফিরিয়ে আনল। বুড়ো চিৎকার করে বলছে, "পালা হারু, পালা। আউধুনির ডাঙা জেগে উঠেছে।"

কথাটা কানে যাওয়ামাত্রই হারু ছুটতে লাগল সামনের দিকে। এখান থেকে বেরোনোর একটাই রাস্তা। আর তা হল সেই গাছের শিকড়ের ফাঁক। আউধুনির ডাঙা জেগে উঠেছে মানে এক মুহূর্ত এখানে থাকা চলবে না।

পিছন থেকে বুড়ো ছুটছে আর চিৎকার করছে, "সব্বনাশি, সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল হারু। তুই ছোট মন্দিরে। দেরি করিসনে। ঘরের বাইরে বেরোনোর আগেই মন্দিরে গিয়ে কাঁসর বাজিয়ে ওদের জানিয়ে দে। দেখিস..."

কথাগুলো কানে ঢুকছে না হারুর। সে টের পাচ্ছে, অন্ধকার মেখে কারা যেন ধেয়ে আসছে তার দিকে। পালাতে হবে। আউধুনির ডাঙা ছেড়ে পালাতে হবে। কোনওক্রমে অভীষ্ট স্থানে পৌঁছেই মশালটা গলিয়ে দিল শিকড়ের ফাঁক থেকে। তারপর মাথাটা গলিয়ে সুনিপুণ কায়দায় দেহটাকে বের করেই সঙ্গে সঙ্গে উবু হয়ে বসে, শিকড়ের ফাঁকে মুখ রেখে চিৎকার করে উঠল, "বুড়ো, হাত দাও। তাড়াতাড়ি হাত দাও..."

কিন্তু না। বুড়ো হাত দিল না।

"আউধুনির মাঠে এঁটো আনতে নেই রে হারু। আনলে এদের খাবার দিতে হয়। ওদের খিদে জিইয়ে রাখতে নেই।" শিকড়ের ফাঁকে মুখ লাগিয়ে উলটোদিক থেকে বুড়ো কাঁপা কণ্ঠস্বরে বলে উঠছে।

"তুই ফিরে যা হারু। ওদেরকে জানা। দেরি করিসনে। সব্বনাশিকে

আটকাতে হবে। ও শয়তানি, ভয়ংকর হয়ে উঠছে দিন দিন। আউধুনির সাড়া আটকে দিতে পারে মানে বুঝেছিস? আমার জন্য ভাবিস না। আমার যাওয়ার সময় হল। আর নতুন একজনের আসার...।"

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই একটা ভয়ংকর শব্দ উলটোদিক থেকে। একটা আর্তনাদ আর একটা চাপা গর্জন একসঙ্গে মিশলে যেমন শব্দ হয়, এ-ও তেমনই। হারুর মনে হল, উলটোদিক থেকে কেউ বা কারা যেন বুড়োকে আচমকা টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলে গেল আউধুনির ডাঙার গভীর অন্ধকারে। যেখান থেকে ফেরার আর কোনও পথ নেই। কোনও পথ নেই।

* * * * * * * * * *

(৩)

এঁটো

"বলো হরি! হরিবোল! বলো হরি! হরিবোল!"

পুরো দলটি ধীরে ধীরে সরকার বাড়ির সদর দরজা ছাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে এল। অনেকটা রাত ঘনিয়েছে। দুটো হ্যাজাকের আলো সামনে-পিছনে নিয়ে এগিয়ে চলছে দলটি। হেমতপুর গাঁয়ের এই পাড়ায় মোটামুটি চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ পরিবারের বসবাস। নির্দিষ্ট কয়েক ঘর বাদ দিলে সকলেরই অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল। আবার এদের মধ্যেই যাদের অবস্থা আরেকটু ভালো, তাদের আবার পাকা বাড়ি। যেমন এই রামকৃষ্ণ সরকারের। সুদের কারবার করে কয়েক বছরেই ভালো টাকা বানিয়েছিল লোকটা।

পাড়ার বাড়িগুলো ঘনসন্নিবিষ্ট নয়। একটা চওড়া মোরামের রাস্তা সদরের দিক থেকে এসে পাড়ার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে সামনের দিকে এগিয়েছে। পাড়ার বাড়িগুলোর মোটামুটি অবস্থান এই রাস্তারই দুইপাশে। এই মুহূর্তে শবযাত্রীদলে পাড়ার সমস্ত পুরুষই হাজির হয়েছে। সকলেরই মুখে এক অন্য

ধরনের উৎকণ্ঠা। কী হয়—কী হয় ভাব। নেহাত পাড়ার আচার তাই আসা। নইলে অনেকেই হয়তো এই সৎকারের দলে থাকতে চাইত না। দলের সম্মুখে মাটির হাঁড়ির মধ্যে আমসার ডুবিয়ে গোবরজল ছড়াতে ছড়াতে সামনে এগিয়ে চলেছে রামকৃষ্ণর ছেলে। বয়স দশ কি বারো। মুখে শোকের চিহ্ন থাকলে এই শোকের গুরুত্ব বুঝতে এখনও অপারগ এই কোমল হৃদয়। এর ওপরে রয়েছে রামকৃষ্ণর মেয়ে। বছর চোদ্দো বয়স। গ্রামেরই একটি স্কুলে দুই ভাই বোনের পঠনপাঠন। তিন কুলে এই পরিবারের তেমন কোনও আত্মীয় না-থাকায়, আজকের পর হয়তো এদের জীবনের অনেক সমীকরণ আপনিই বদলে যাবে।

হরিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে ভেসে আসছে কীর্তনদলের গান। দলটির পিছনের দিকে খুব ধীরপদে হাঁটছেন তিরোধান মুখোপাধ্যায়। তিনি শেষ মুহূর্তেও চাইছিলেন, অন্তত কিছু চমৎকার ঘটুক। কিছু হোক। সকলে অন্তত বিশ্বাস করুক, এই রামকৃষ্ণ মড়িক্ষণে মৃত। তাঁর সৎকার করা সম্ভব নয়। কিন্তু না, কিছুই হল না। রামকৃষ্ণর মড়া গৃহের বাইরে এসে গিয়েছে। গৃহবন্ধন কেটে গিয়েছে এই মড়ার। দেখতে দেখতে পাড়ার বাইরেও চলে যাবে। হা ঈশ্বর! তিরোধানের চোখ ভয়ংকর কিছুর চিন্তায় ঝাপসা হয়ে উঠল। আজকের পর যে প্রলয় নামবে পুরো এলাকা জুড়ে তা যেন স্পষ্টই চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন তিরোধান মুখুজ্জে। কিন্তু তিনি নিরুপায়।

এসবই ভাবছিলেন তিরোধান মুখুজ্জে। ঠিক এমন সময় কানে কী একটা এসে পৌঁছোতেই সমস্ত স্নায়ু এক মুহূর্তের জন্য যেন কাজ করা বন্ধ করে দিল তাঁর। হরিবোল আর কীর্তনের উচ্চস্বরে প্রথমে তিনি ভাবলেন, তিনি ভুল শুনছেন, কিন্তু সকলের পিছনে থাকায়, একটু দাঁড়িয়ে পড়তেই শব্দটা ঈষৎ স্পষ্ট হয়ে তাঁর কানে এসে ধরা পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল, কেউ যেন তাঁর পা-জোড়া টেনে মাটির মধ্যে গেঁথে দিয়েছে। যেখান থেকে তাঁর যেন এক মুহূর্তও নড়ার ক্ষমতা নেই। থামাতে হবে, এদের থামাতে হবে। সর্বনাশ হয়ে গেছে!

"দাঁড়াও... তোমরা দাঁড়াও।" চিৎকার করে উঠলেন মুখুজ্জে মশাই। কিন্তু হরিবোল আর কীর্তনের উচ্চস্বরে সেই চিৎকার কোথাও যেন চাপা পড়ে গেল। দেখতে দেখতেই কীর্তনদলটা ওঁকে ছাড়িয়ে সামনের দিকে কিছুটা এগিয়ে এসেছে।

"থামো... থেমে যাও..." শরীরের সমস্ত শক্তি জড়ো করে তিনি ছুটে গেলেন সামনের দিকে। তারপর চিৎকার করতে লাগলেন পাগলের মতো, "থেমে যাও। থেমে যাও তোমরা। থেমে যাও বলছি।"

আচমকা তিরোধানবাবুর এই আচরণে থেমে গেল হরিধ্বনি। থেমে গেল কীর্তনের গান। থমকে দাঁড়াল পুরো দলটা।

সনাতন বাউড়ির গলায় উষ্মা। বুড়োটা এখনও জ্বালাচ্ছে।

"কী হয়েছে, মুখুজ্জে মশাই? পথ আটকাচ্ছেন কেন? শবযাত্রায় বেরিয়েছি, এমন কাজে কেউ মাঝপথে আটকায়! এই তো..."

তাকে কথাটা শেষ করতে দিলেন না তিরোধানবাবু। তার আগেই ভয়-পাওয়া চোখে ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে বের করলেন এক অদ্ভুত শব্দ, "**শশশশশ...!**"

তাঁর ইঙ্গিতে সকলে চুপ করতেই, বহু দূর থেকে ভেসে-আসা এক রিনরিনে স্বর শুনতে পাওয়া গেল। রিনরিনে... কিন্তু বিচ্ছিন্ন নয়। কেউ বা কারা যেন একনাগাড়ে কাঁসর বাজিয়ে চলছে। সেই বিরামহীন ধ্বনি শুনে কারও বুঝতে বাকি রইল না, এই শব্দ আসছে পশ্চিমের জঙ্গল থেকে। এই ধ্বনি, সংকেতধ্বনি। যার জন্য তাঁরা অপেক্ষা করছিলেন দুপুর থেকে। সেই ধ্বনি এখন বেজে উঠেছে। মড়িক্ষণের সংকেতধ্বনি!

তিরোধানবাবু হ্যাজাকের আলোয় দেখলেন, শবযাত্রীদলের প্রত্যেকের মুখ এক মুহূর্তেই অদ্ভুত আতঙ্কে কেমন যেন সাদা হয়ে গিয়েছে।

"এবার? এবার কী করব?" দলের মধ্য থেকে একটা কাঁপা স্বর বাইরে বেরিয়ে আসতেই তিরোধানবাবু চিৎকার করে উঠলেন, "এক মুহূর্ত এখানে

নয়... এক মুহূর্তও। সবাই সরকারদের বাড়িতে চলো। এক্ষুনি...”

তিরোধানের নির্দেশ পাওয়ামাত্র সকলেই ছুটল সরকার বাড়ির দিকে। মাথায় কাঠের বোঝা যারা বইছিল, তারা কাঠ ফেলে দৌড় লাগাল ওই বাড়ির দিকে। যে ছয়জন রামকৃষ্ণর মড়া বইছিল, তারাও দ্রুত হাঁটতে লাগল। এই হুইহট্টগোলে রামকৃষ্ণ সরকারের ছোট্ট ছেলে বিলু কী করবে বুঝতে না পেরে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল থম মেরে। তিরোধানবাবু দেরি না করে তার হাতখানা চেপে ধরে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন বাড়ির দিকে।

মড়িক্ষণে মৃত মড়া ঘরের বাইরে বেরিয়েছে! এর ফল কী হতে পারে, তা তাঁর নিজের জানা নেই। ভয় আর উত্তেজনায় তাঁর ভেতরে থাকা হৃৎপিণ্ড যেন লাফিয়ে বুকের বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে। ওদিকে একনাগাড়ে তখনও ভেসে আসছে কাঁসরের ঘণ্টা। নাহ্, নাহ্, নাহ্, অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে।

হুড়মুড় করে ছয়জন লোক রামকৃষ্ণর শবদেহটা নিয়ে ঘরের চৌহদ্দির মধ্যে ঢুকে পড়তেই তাঁদের পিছন পিছন ঢুকে এলেন তিরোধানবাবু। ঘরের মধ্যে গিজগিজ করছে লোকে। প্রত্যেকের মুখ যেন ভয়ে পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে। আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে চাপাস্বরে আলোচনায় এক জোরালো গুঞ্জন উঠেছে উঠোনের মধ্যিখানে। তিরোধানবাবু ছেলেটির হাত ধরে উঠোনের মধ্যে নেমে দাঁড়াতেই সকলেই তাঁর মুখের দিকে তাকাল। যেন এই বিপদ হতে উদ্ধার হওয়ার রাস্তা একমাত্র তাঁর কাছেই পাওয়া যাবে।

তিরোধান মুখুজ্জে নিজেই ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে আছেন। কিন্তু এই সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করতে হবে। ওদিকে যারা রামকৃষ্ণর শব বইছিল, তারা শবটাকে কাঁধ থেকে নামাতে উদ্যত হতেই তিরোধানবাবু গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলেন, “ওটা আর নামাতে হবে না এখানে। ওটাকে তোমরা ছাদে রেখে এসো। আমি আসছি একটু পরেই।” গ্রামপ্রধানের নির্দেশ পাওয়ামাত্রই তারা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। হ্যাজাকের আলো পড়ছে উঠোনে দাঁড়িয়ে-থাকা প্রত্যেকের মুখে। তিনি দেখলেন, সনাতন বাউড়ি

একপাশে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"আমি বলেছিলাম আপনাদের। আপানারা শোনেননি। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যাহ্নের পর কেউ মারা গেলে তা মড়িক্ষণে পড়ে। এই তত্ত্ব আপনারা মানতে চাননি। আপনাদের বিশ্বাস ছিল ওই দু-দিনের ছোঁড়া সনাতন বাউড়ির ওপর। এবার? এবার কী করবেন?"

"পশ্চিমের জঙ্গল থেকে কাঁসরের শব্দ না এলে তো বোঝা সম্ভব ছিল না, ভাই। আমরা বুঝব কেমন করে? সত্যিই তো এতক্ষণ কোনও শব্দ হয়নি।" কৃষ্ণপদ বারুই মিনমিন স্বরে কথাটা বলে উঠতেই মুখুজ্জেবাবু উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলেন, "আপনারা জানতেন না তাঁর ক্ষমতা? সে কী কী করতে পারে। আমার বিশ্বাস, এতক্ষণ যে কাঁসরের শব্দ শুনতে পাওয়া যায়নি, এর পিছনে নিশ্চয়ই তাঁর কোনও হাত রয়েছে।"

"এসব ছাড়ুন মুখুজ্জে মশাই। যা হয়ে গিয়েছে, সেই নিয়ে ভেবে আর লাভ নেই। এখন কী করব, সেটা বলুন?" সনাতন বাউড়ি সেই পুরোনো ঔদ্ধত্যপূর্ণ স্বরে কথাটা বলে উঠতেই তিরোধানবাবুর যেন মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বাকিদের উদ্দেশে বলে উঠলেন, "আপনারা যে যার বাড়ি ফিরে যান। যত দ্রুত সম্ভব নিজেদের তৈরি করুন। সময় হয়ে এল প্রায়...। মড়িক্ষণে কেউ মরলে কে আসে, সেটা আমরা সকলেই জানি। আর এ-ও জানি, ওই সময় আমাদের কী করতে হবে। মনে রাখবেন, ঘরের একটা দরজা-জানালাও যেন খোলা না থাকে।"

* * * * * * * * * *

খোলা ছাদের ঠিক মাঝবরাবর খাটিয়ার ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে রামকৃষ্ণ সরকারের মৃতদেহ। হ্যারিকেনের আলোয় কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চোখের ওপরে রাখা তুলসীপাতা এখনও দৃশ্যমান। তিরোধানবাবু ঘাড় তুলে দেখলেন, পশ্চিমের কালো আকাশটা আচমকাই বদলে যেতে শুরু করেছে

গাঢ় কমলা রঙে। গলাটা আচমকাই শুকিয়ে এল তাঁর ওইদিকে তাকিয়ে। খুব ধীর লয়ে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে খাটিয়ার পাশে গুঁজে-রাখা ধূপের গন্ধ।

হে ঈশ্বর! কতদিন? আর কতদিন? এই অভিশাপ কি কখনোই শেষ হবে না? অজান্তেই একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বুক ঠেলে।

তিরোধানবাবু আর দেরি না করে, ডান হাতে ধরা গোবরজলের হাঁড়িটা পুরো উপুড় করে দিলেন রামকৃষ্ণর মৃতদেহের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দলা দলা গোবর ছড়িয়ে পড়ল মড়ার ওপর। আজ রাতে সে আসছে নিজের খাবার খেতে। তাঁর জন্য সব কিছু তৈরি করে রাখতে হবে না?

মাটির হাঁড়িটা আছাড় মেরে ভেঙে টুকরো করে দিলেন তিরোধানবাবু। তারপর দ্রুতপায়ে নেমে এলেন সিঁড়ি বেয়ে। ডানদিকের একটি ঘরের প্রায় বন্ধ দরজার ফাঁক গলে হ্যারিকেনের হলুদ আভা বেরিয়ে আসছে বাইরে। তিরোধানবাবু দেরি না করে ঘরের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতেই দেখতে পেলেন, মেঝের ওপর মাদুর পেতে শুয়ে ছিল রামকৃষ্ণর বিধবা স্ত্রী। আর তারই পায়ের কাছে শূন্যদৃষ্টিতে বসে রয়েছে তারই ছেলেমেয়ে।

তিরোধানবাবুকে ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেখেই ধড়ফড় করে উঠে বসল সেই মহিলা।

"বউমা?"

"বলুন দাদা।" মহিলা ধরা কণ্ঠে বলে উঠতেই তিরোধানবাবু বলে উঠলেন, "রামকৃষ্ণকে মড়িক্ষণে পেয়েছে। এর মানে তুমি জানো।"

মহিলাটি মুখে কাপড় চাপা দিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠতেই তিরোধানবাবু অস্থির হয়ে উঠলেন—"এখন এসবের আর সময় নেই, বউমা। সে আসছে। তোমায় শক্ত হতে হবে।" কয়েক মুহূর্ত থেমে তিনি আবার বলে উঠলেন, "মড়িক্ষণের মড়া ঘরের বাইরে বেরিয়েছে সৎকারের জন্য। জানি না আজকের রাতে কী হতে চলেছে, কিন্তু একটা কথা খুব ভালো করে শুনে রেখো, তোমরা কেউই ছাদে যাবে না আজ রাতে। ছাদে কেন? এই ঘরেরই বাইরে বেরোবে না। কোনও মূল্যেই না।"

"আরেকটা কথা, যেটা কোনওভাবেই যেন ভুল না হয়, সেটা হল, সে একবার আসে... তাঁর খাবার খায়। আধখাওয়া খাবার ফেলে সে আবার চলে যায়। পরে আবার আসে বাকিটা খেতে। এই একবার চলে গিয়ে, আরেকবার আসার মাঝের সময়ের মধ্যে তোমাদের তিনজনের মধ্যে ভুলেও কেউ যেন সেই এঁটো খাবার না দেখে ফ্যালে। দেখে ফেললেই কী হবে, সেটা আমরা জানি...।"

রামকৃষ্ণর স্ত্রী পুরোটা শুনে কোনওরকমে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি জানাল। সে জানে এগুলো।

"আজকের রাতটা পার করে নাও বউমা। কাল থেকে এই কয়েকদিন ছোটবউমাকে পাঠাব তোমার সঙ্গে থাকার জন্য।" কথাটা বলেই দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন তিরোধানবাবু। তিনি জানেন না কী হতে চলেছে। কিন্তু একটা ভয়ংকর কু ডাকছে তাঁর মনের গহিনে।

ঠিক এমন সময় রামকৃষ্ণর ছেলে তাঁকে পিছন থেকে ডেকে উঠল, "দুবার কে খাবার খেতে আসে, জেঠু?"

ছেলেটির বয়স কম তাই কৌতূহল বেশি। তিরোধানবাবু প্রশ্নটা শুনে একটা বিষণ্ণ হাসি হেসে তাকালেন তার দিকে। কিন্তু উত্তরে কিছু বলবার আগেই তিরোধানবাবুকে বিহ্বল করে ছেলেটি বলে উঠল, "আমি জানি, কে আসছে... বাবাকে খেতে মড়ি আসছে, তা-ই না?"

* * * * * * * * * * *

"বেরোনো তো দূরের কথা... কেউ কোনও শব্দও করবে না। বুঝতে পেরেছ?"

নিরুপতি তালুকদারের সদরগঞ্জের ঘাটে বড় মুদি দোকান রয়েছে। এমনিতে দুপুরবেলা বাড়িতে এসে, একটু বিশ্রাম নিয়ে বিকেলের দিকে আবার রওনা হয় দোকানের দিকে। কিন্তু আজ দুপুরের পর যা হয়ে চলেছে, এখন মনে

হচ্ছে, এবেলার মতো দোকান বন্ধ রেখে সে ভালোই করেছে। সে-ও ওই শবযাত্রীদলেরই একজন ছিল। আচমকা মুখুজ্জেবাবুর চিৎকারে সে-ও বিহ্বল হয়ে পড়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরক্ষণেই সেই কাঁসর বাজানোর শব্দে তার বুকের ভেতর নিমেষে ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল। সকলের মতো মুখুজ্জেবাবুর নির্দেশ মেনে সে-ও তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে এসেছে। মড়ি আসছে তার খাবার খেতে। সে জানে না মড়ি কে। কখনো দেখেনি সে মড়িকে। দেখতে চায়ও না। সে শুধু জানে, অনেকদিন আগে বিধাতা পুরো হেমতপুরের কপালে এক অভিশাপ এঁকে দিয়েছেন। আর সেই অভিশাপের নাম হল মড়ি।

নিরুপতি দ্রুতহাতে ঘরের সব ক-টা দরজা-জানালা বন্ধ করছে। অন্য ঘরের দরজা-জানালা সে আগেই বন্ধ করেছে। ঘরের মাঝে পালঙ্কের ওপর মায়ের কোল ঘেঁষে বসে রয়েছে নিরুপতির দুই ছেলে, এক মেয়ে। তারা ভয়ার্ত দৃষ্টিতে চুপটি করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

হাতের কাজ শেষ করে নিজের স্ত্রী-র দিকে ফিরল নিরুপতি—"আমি তোমার নাম ধরে তিনবার ডাকব। তবেই দরজা খুলবে, কেমন? তার আগে কিন্তু একেবারেই নয়। এখন এসো, দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দাও।"

কথাটা বলেই দেরি না করে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াল নিরুপতি। হাতে একটা হ্যারিকেন। আশপাশের প্রত্যেকটা বাড়ির পুরুষপ্রধানরা ইতিমধ্যেই বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

নিরুপতির স্ত্রী দরজা বন্ধ করবার আগে ভয়ার্ত কণ্ঠে বলে উঠল, "এর চেয়ে ভালো হত, গতবারের মতো আমায় বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে। আমার খুব ভয় করছে।"

"সময় থাকলে তা-ই পাঠাতাম। কিন্তু সময় আর পেলাম কই?" নিরুপতির নিজের ভেতরেও অস্থিরতা। আজ কী হতে চলেছে, সে নিজেও জানে না। কিন্তু তার ভেতরে যে ভয় রয়েছে, সেটা বাকিদের টের পেতে দিলে চলবে না। "তুমি দরজা লাগিয়ে ভেতরে যাও। ভয় পেয়ো না। কিছু হবে না।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়ার সমস্ত বাড়ির সদর দরজা ভেতর থেকে বন্ধ হয়ে

গেল। আর ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে রইল বাড়ির প্রধানরা। নিরুপতি আচমকা টের পেল, চারদিক আচমকাই বড় বেশি শান্ত, বড় বেশি চুপচাপ হয়ে গিয়েছে। তার মানে সময় হয়ে গিয়েছে তার আসার।

বাকিদের মতো নিরুপতিও সদর দরজার দিকে পিঠ করে বজ্রাসনে বসবার ভঙ্গিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। ডান পাশে সরিয়ে রাখল হ্যারিকেনটা। মাথার ওপরের কালো আকাশটা কেমন যেন কমলা রঙের হয়ে উঠেছে আপনা থেকেই। যেন একটু পরেই সূর্য উঠবে কালো আকাশে।

বাকিদের মতো নিজের ঘরের সামনেও একই ভঙ্গিতে বসে ছিলেন তিরোধান মুখোপাধ্যায়। চোখের দৃষ্টি বাড়িরই ঈশানকোণে পোঁতা একটি বাঁশের মাথায়। সেখানে একটা লাল শালু হালকা হাওয়ায় পতপত করে উড়ে চলেছে। মুখুজ্জে মশাই একদৃষ্টিতে সেইদিকে তাকিয়ে আছেন। উড়ছে উড়ছে উড়ছে... পতকাটা উড়ছে আর তারপরেই উড়তে উড়তে হঠাৎ করে থম মেরে নেতিয়ে পড়ল বাঁশের মাথায় বাঁধা লাল শালুটা। তিরোধানবাবু টের পেলেন, আচমকাই হুট করেই জায়গাটা যেন বায়ুশূন্য হয়ে পড়েছে। আর ঠিক এটুকু ভাবতে যতক্ষণ। সঙ্গে সঙ্গে দপ করে নিবে গেল তার পাশে জ্বলতে-থাকা হ্যারিকেনের আগুন। অন্ধকারে ডুবে গেল চারদিক। আর বাতাস ভারী হয়ে উঠল একটা উগ্র ভারী গন্ধে। এই গন্ধ চিতায় আগুন ধরানোর গন্ধ। ঘি, কাঠ আর চামড়া পুড়লে যেমন ভারী গন্ধে বাতাস ভরে ওঠে, এ গন্ধ তেমনই।

এক মুহূর্ত দেরি না করে, চোখ বন্ধ করে, দুই হাত দিয়ে দুই কান চেপে ধরে, চিৎকার করে পড়তে লাগলেন একটি ছড়া। ধীরে ধীরে অনেকগুলো স্বর ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে। বোঝা যাচ্ছে, অন্ধকারে বসে প্রত্যেকটা ঘরের সামনে বসে পুরুষপ্রধানরা পাঠ করে যাচ্ছে একটিই ছড়া...

"মড়ি মড়ি মড়ি
মড়ার মাথায় নড়ি
নড়ি চাটে নেউল

বিরান হল দেউল
দেউল ভাঙি দাঁতে
মড়ি আসে রাতে।।
পুনম রাতে আঁধার
মড়ি আসে দুবার
মড়ির প্রথম ছোঁয়া
ছোঁয়ায় বাঁধা নোয়া
ফিরতি মুখের আগে
উঠবে মড়ি জেগে
জাগলে এঁটো মড়া
মড়ির হাতে ধরা।"

(৪)

ছাদে কে?

একটা অদ্ভুত গন্ধে ঘুম ভেঙে গেল বিলুর। ঘরের ভেতরটা এই মুহূর্তে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এককোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছিল একটু আগেও, সেটাও এই মুহূর্তে নেবানো। বিলু নাকে হাত চাপা দিল। এরকম অদ্ভুত গুমোট গন্ধ সে এর আগে অনেকবার পেয়েছে। সরস্বতীপুজোয় হোম হলে এরকম গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিলু তাড়াতাড়ি নাকে হাত চাপা দিয়ে চারদিকে হাতড়াতে লাগল। সে কোথায় আছে? মা আর দিদির সঙ্গে সে তো ঘরের ভেতরে মাদুরের ওপরই বসে ছিল, এরই মধ্যে কখন যে তার ঘুম ধরে গিয়েছিল, সে বুঝতে পারেনি। কিন্তু মা আর দিদি কোথায়? আর আলোই বা জ্বলছে না কেন ঘরের?

"মা " বিলু গলা উঁচু করে ডাকল। নাহ্, কোনও সাড়া নেই। "দিদি...?" আবার কোনও সাড়া নেই।

ঠিক এমন সময় তার চোখ জানালার ফাঁক গলে বাইরের এক বিন্দু আলোর দিকে পড়ল। এ কী? সকাল হয়ে গেল নাকি? সে এতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল! ওহ্, তার মানে ভোর হয়ে গিয়েছে, তাই মা-দিদি এখানে নেই? ঠিক এমন সময় বিলুর কানে এল, বাইরে কারা যেন ছড়া আওড়াচ্ছে একনাগাড়ে। বিলু কান পেতে শোনার চেষ্টা করল সেই ছড়া।

"মড়ি মড়ি মড়ি...
মড়ার মাথায় নড়ি..."

লোকজন তো বাইরেই রয়েছে। তাহলে ওই জেঠু কেন বলল ঘরের বাইরে না বেরোতে? মা আর দিদিও কি বাইরে? ইশ্! তাকে ঘরের মধ্যে একলা ফেলে চলে গেল! দেরি না করে, অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই চমকে উঠল বিলু।

লম্বা বারান্দায় একপাশ জুড়ে তিনটে বড় বড় ঘর। বারান্দায় দাঁড়ালেই সামনের সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো উঠোন আর উঠোন শেষে উঁচু পাঁচিলটা চোখে পড়ে।

এ কী? বাইরে তো এখনও রাত্রি? কিন্তু সে যে আলো দেখল একটু আগেও। ঠিক এমন সময় তার দৃষ্টি আকাশের দিকে পড়তেই বুঝতে পারল, তার ভুল কোথায় ছিল। আকাশটা পুরো কমলা রঙের আলোয় ভরে উঠেছে যেন। জানালার পাল্লার ফাঁক গলে এই আকাশেরই এক টুকরো অংশ দেখে সে ভেবেছে, নিশ্চয়ই সকাল হয়ে গিয়েছে। নিজের বোকামিতে মনে মনেই হেসে উঠল বিলু। বাইরে বেরোতেই সে খেয়াল করেছে, ছড়ার আওয়াজটা স্পষ্ট হয়েছে।

"পুনম রাতে আঁধার
মড়ি আসে দুবার"

শুধু স্পষ্টই নয়, সে বুঝতে পারছে, সারা পাড়া জুড়ে এই ছড়া আওড়ে যাচ্ছে লোকজন। ক-দিন ইস্কুলে যেতে পারবে না। ইস্কুলে গেলে রমেশকে জিজ্ঞাসা করবে, এই ছড়ার মানে কী? আর সকলেই এই ছড়া আওড়াচ্ছে কেন?

কিন্তু মা আর দিদি কই? কই, তাদের তো দেখা যাচ্ছে না? বাইরে থাকলে তো দেখা যেত। তারা কি তার মতো ঘুমিয়ে আছে ঘরের মধ্যেই? হতে পারে। ভাবতে ভাবতেই চোখ কচলাতে কচলাতে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই থমকে গেল সে।

ছাদে কে? বিলুর যেন স্পষ্ট মনে হল, ছাদে কেউ যেন একবার লাফ দিল। ছাদে কেউ কি আছে? কিন্তু এত রাতে ছাদে কে থাকবে? মা? না দিদি? নাকি দুজনেই? ওরা বাবাকে ছাদে রেখে এসেছিল না? তাহলে মা কি একবার বাবাকে দেখতে ছাদে গিয়েছে?

বারান্দার শেষ মাথায় একটা চওড়া সিঁড়ি। বিলু দেখল, অন্ধকার যেন সেই কোণটুকুতে জমাট হয়ে রয়েছে। সে দেরি না করে অন্ধকারের মধ্যেই সেইদিকে এগিয়ে গেল। বাবার জন্য তার মন খারাপ করছে। বাবা মারা গিয়েছে। কোনওদিন সে আর বাবাকে দেখতে পাবে না। বাবা তাকে কোনওদিন আদর করবে না। এসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখ কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। কথায় বলে, অন্ধকারের নিজস্ব একটা আলো রয়েছে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে থাকলে সেই অন্ধকারও চোখে সয়ে যায়। বিলুরও হয়েছে সেই অবস্থা। সে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একবার-দুবার ইচ্ছা হল 'মা' বলে ডাকতে। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের ইচ্ছাকে সামলে নিল। ঘর থেকে বেরোনোর জন্য মা যদি তাকে বকাবকি করে। সে শুধু দূর থেকে একবার মা-কে দেখেই চলে আসবে। দেখতে দেখতেই বিলু সিঁড়ির শেষ মাথায় চলে এল। চিলেকোঠার দরজা দিয়ে উজ্জ্বল আকাশের আভা সিঁড়ির মুখটায় এসে পড়ছে। বিলু ধীরে ধীরে ছাদে এসে উঠে দাঁড়াল। বাহ্! এখানটা তো অন্ধকার নয়। বরং আকাশের কমলা আভার জন্য

চারদিকটা বেশ দৃশ্যমান। এখানে সেই গন্ধটা আরও তীব্র।

কিন্তু মা কই? কথাটা ভাবতে ভাবতেই কানে একটা অদ্ভুত শব্দ এসে ঠেকল। কেউ মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়াকালীন গলার কারসাজি দেখালে যেমন শব্দ বের হয়, এ-ও তেমনি। বিলু যেই ছাদের বামদিকে তাকাল, মনে হল, এক নিমেষে বুকের ভেতরের সবটুকু হাওয়া কে যেন শুষে নিল। ওটা কী? কী ওটা?

ছাদের ঠিক মাঝবরাবর শূন্যে ভাসছে একটা শরীর। শরীরটা কোমরের দিক থেকে এমনভাবে বেঁকে গিয়েছে, এক লহমায় দেখলে মনে হবে, ঠিক যেন একটা ঘোড়ার নাল ভাসছে শূন্যে। কিন্তু ও কী? ও কী অবস্থা হয়েছে বাবার? এতদূর থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, কেউ যেন রামকৃষ্ণর নগ্ন শরীরটাকে খুবলে খুবলে খেয়ে গিয়েছে। মুখের বুকের ঘাড়ের কাছে হাতের পায়ের... সব জায়গার, কোনও জায়গা বাকি নেই। বাঘে ঠিক যেমন করে মানুষের মাংস খুবলে খায়, এ-ও তেমনই। বিলুর হাত-পা যেন অবশ হয়ে গিয়েছে। মাথার ওপর কমলা আকাশ, বাতাস ভারী করা উগ্র কাঠপোড়া গন্ধ, আশপাশ থেকে ভেসে-আসা সেই ভয়ংকর ছড়া, আর চোখের সামনে শূন্যে ভাসতে-থাকা বাবার আধখাওয়া মৃতদেহ।

বিলু জানে, তার আর এক মুহূর্ত এখানে থাকা উচিত নয়। কিন্তু তারপরেও সে ধীরে ধীরে মন্ত্রমুগ্ধের মতো বাবার দিকে এগিয়ে চলেছে। নিজেকে আটকাতে পারছে না। দেখতে দেখতেই বিলু রামকৃষ্ণর শরীরের একদম কাছে চলে এল। উফ! কী বীভৎস লাগছে বাবাকে দেখতে... তার শরীর খারাপ করছে। নাহ্! সে বাবাকে আর এইভাবে দেখতে চায় না। আনমনা হয়ে এসবই ভাবছিল বিলু, কিন্তু আচমকা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, কেউ যেন তাকে দেখছে। চমকে উঠে সামনের দিকে তাকাতেই প্রবল আতঙ্কে বিলুর পেটের ভেতরটা খালি হয়ে গেল।

শূন্যে ভাসতে-থাকা বাবার দেহটা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। শুধু তাকিয়েই নয়। নাক, ঠোঁট, গাল খুবলে-খাওয়া বিশ্রী মুখে ফুটে

ছাদের ঠিক মাঝ বরাবর শূন্যে ভাসছে একটা শরীর।

উঠেছে এক ভয়ংকর শব্দহীন হাসি। বিলু প্রচণ্ড আতঙ্কে ছিটকে পড়ল ছাদের মেঝেতে। গলার ভেতর থেকে একটা চিৎকার ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে, কিন্তু পারছে না। কে যেন তার স্বর আটকে দিয়েছে। মাটিতে বসে বসেই বিলু চেষ্টা করছে পিছনে সরে আসার, কিন্তু পারছে কই? সারা শরীর তার যেন আচমকাই পাথরের মতো ভারী হয়ে উঠেছে।

ওদিকে শূন্যে ভাসতে-থাকা আধখাওয়া মড়াটা ধীরে ধীরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ছাদের ওপর। ঠিক সোজা নয়, হাঁটুজোড়া ভাঁজ করে, কোনও শরীর সামনের দিকে ঝুঁকে থাকলে যেমন দেখতে লাগবে, ঠিক তেমনই। চোখের দৃষ্টি খোলা, মুখে সেই একই শব্দহীন হাসি। দেহটা বাইরে থেকে ভেসে-আসা ছড়ার তালে তাল রেখে অল্প অল্প করে দুলছে।

ঠিক এমন সময় নীচ থেকে ভেসে এল রামকৃষ্ণর স্ত্রী-র কণ্ঠস্বর।

"বিলু...? বিলু...? কই তুই?"

চমকে উঠল বিলু। মা ডাকছে নীচ থেকে। মা জানে না বাবার কথা। মা-কে জানাতে হবে... ঠিক এমন সময়ই একটা অদ্ভুত শব্দ শুনে আপাদমস্তক শিউরে উঠল বিলু। দেহটি কখন যেন একেবারে তার পায়ের কাছে এসে উবু হয়ে বসেছে, সে টের পায়নি। সেখানে বসে বসেই শরীরটাকে দুলিয়ে দুলিয়েই একটা বিশ্রী শব্দে হাসছে সে। বুক-পেটের ভেতর থেকে একটা খিকখিক শব্দ বিকট আকারে গলা ঠেলে বেরোলে যেমন শুনতে লাগে, এ-ও তেমনই। সে হাসি শুনে যে কারোই হাত-পা আরও অবশ হয়ে যায়।

"বিলু..." আবার নীচ থেকে মায়ের ডাক। ডাকটা ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে। আচমকা দেহটা সিঁড়ির দিকে তাকাল। মায়ের ডাকটা বোধহয় শুনতে পেয়েছে এই ভয়ংকর জিনিসটা।

বিলু কথা বলতে পারছে না। মা-কে চিৎকার করে পালাতে বলতে পারছে না। তাকে বাঁচাতে বলতে পারছে না। কিছু করতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে, এই ভয়ংকর জিনিসটা তাকে মেরে ফেলবে। তাকে মেরে ফেলবে...।

আচমকা দেহটা যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য উবে গেল বাতাসে। তারপর

আবার ফিরে এল কয়েক মুহূর্তের জন্য। বিলুর ভেতরটা যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। কই? কই? মায়ের ডাক তো আর শোনা যাচ্ছে না। তাহলে কি...

আচমকা দেহটা দোলা থামিয়ে টানটান হয়ে বসল। আর তারপর ধীরে ধীরে বিলুর দিকে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে উঠে এল...। জিনিসটা ধীরে ধীরে তার বুকের কাছে উঠে এসেছে। ঘাড়ের এক খাবলা মাংস চামড়ায় লেগে তখনও ঝুলছিল দেহটা থেকে। সেটা ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলছিল।

বাইরে থেকে ভেসে আসছে ছড়ার আওয়াজ। কিন্তু বিলু কিছু শুনতে পাচ্ছে না। তার চেতনা অবশ হয়ে গিয়েছে। তার শক্তি লোপ পেয়েছে যেন। বিলুর মনে হচ্ছে, সে দু-চোখে অন্ধকার দেখছে। ভয়ংকর জিনিসটা তার সবটুকু শক্তি শুষে নিচ্ছে হু হু করে। ঠিক এরকমই অবস্থায় বিলু শুনতে পেল আচমকা দড়াম করে একটা দরজা খোলার শব্দ। চিলেকোঠার দরজাটা কেউ একজন সজোরে ধাক্কা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা চিৎকার। কে চিৎকার করল? মা? নাহ্! মা তো নয়। শুনে তো মনে হল এক পুরুষের গলা। চিৎকার শুনেই মড়াটা বিলুর বুকের ওপর থেকে সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রবল আক্রোশে সেই দেহের গলা চিরে বেরিয়ে এল একটা ঘোঁতঘোঁতে শব্দ। কিন্তু কিছু করবার আগেই একটা বিশ্রী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। আর তারপরেই একটা হ্যাঁচকা টান। আর তারপরে বিলুর আর কিছু মনে রইল না। শুধু সব কিছু অন্ধকার হওয়ার আগে সে টের পেল, কালো পোশাক-পরা একটা শরীর তাকে দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে ততক্ষণে।

(দ্বিতীয় খণ্ড)

(১)

কে আসে?

"আ, ম'ল যা! রকম দেখ তোরা। বলি ও বউ, শুয়ে-থাকা মানুষকে কেউ পেন্নাম করে? বলি এ কি মড়া নাকি?" মোটা করে মহিলাটা কথাটা বলতেই ঘরের মধ্যে একটা হাসির রোল উঠল যেন। "বলি, বাপের বাড়িতে কিছুই শেখোনি দেখছি।"

খাটের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল বছর পঁয়ত্রিশের বীথি। এই বিদ্রুপ যে তাকে উদ্দেশ করেই বলা হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেই সর্বাঙ্গে কেউ যেন তার আগুন ধরিয়ে দিল। কিন্তু মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিয়ে দরজার সামনে জড়ো-হওয়া মহিলাদের ছোটখাটো দলটির দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসল। নাহ্! এসেই এদের সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়া উচিত হবে না।

বারো বাই পনেরো ফুটের একটা বড় সাদা মার্বেল মেঝের ঘর। ঘরের ঠিক মাঝবরাবর একটি খাট পাতা রয়েছে। সেই খাটের ওপর শুয়ে রয়েছেন একজন বয়স্ক মহিলা। বয়স আন্দাজ করা যায় না। হাত-পায়ের ফরসা চামড়া কুঁচকে গিয়েছে। মাথার চুল শণনুড়ির মতো সাদা। রুগ্‌ণ শরীর যেন বিছানার সঙ্গে মিশে গিয়েছে প্রায়। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। সারা মুখে বলিরেখার অজস্র কাটিকুটি। শরীর দেখলেই বোঝা যায়, একসময় এই শরীরে যৌবনের চটক থাকলেও দীর্ঘদিনের রোগভোগের কারণে সেই শরীর আজ ক্ষয়িষ্ণু।

এই ঘরে খাট ছাড়াও আর যা যা রয়েছে তা মোটামুটি গৃহের সচ্ছলতারই নিদর্শন বহন করে। ঘরের দক্ষিণ পাশের বড় বড় জানালা। উঁচু ছাদ। সেগুন কাঠের আলমারি, দামি ড্রেসিং টেবিল। সব কিছু মিলিয়েই বেশ আভিজাত্য-মোড়া ব্যাপার রয়েছে পুরো বাড়ি জুড়ে।

"বলি ও বউঠান। মরবার সময় তোমার দেখি কপালে আরেক জ্বালা এসে জুটল। বলি, বউকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারবে, এমন সময় হাতে আছে তো?" মোটা মহিলাটির বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। মধ্যবয়স্কা বাঙালি গৃহবধূর মতোই সাজ। মাথায় কাঁচাপাকা চুলের আস্তরণের মাঝে সিঁথিতে সিঁদুর তার এয়োস্ত্রী হওয়ার প্রমাণ বহন করছে। এমনিতে ঠিকঠাক, কিন্তু আসার পর থেকেই অদ্ভুত একটা তাচ্ছিল্যের সুরে কথা বলেছেন উনি বীথির সঙ্গে।

"আচ্ছা, হয়েছে কাকিমা। তখন থেকে মেয়েটার পিছনে পড়ে রয়েছ।" ভিড়ের মধ্যে থেকে এক কমবয়সি বউ এগিয়ে এল বীথির দিকে। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল মেয়েটি বিধবা। "সবাই তো সবটুকু শিখে আসবে না। আমরাও তো জানতে জানতেই শিখেছি। তা-ই না?" কথাটা বলেই মেয়েটি বীথির থুতনি ধরে মুখটা তুলে বলল, "দেখি ভাই। চাঁদপানা মুখটা দেখি।"

বীথির অনেকক্ষণ ধরেই এসব ভালো লাগছিল না। এতটা জার্নি, এত ভিড়, এত কথা, এত লোকজন সত্যিই তার পছন্দ হচ্ছিল না। খানিকটা বিরক্ত হয়েই, ঝটকা মেরে বউটির হাতটা সরিয়ে দিল থুতনি থেকে, তারপর খানিকটা রুক্ষস্বরেই বলে উঠল, "এসব কী? গায়ে হাত দিচ্ছেন কেন? আমার এসব একদম পছন্দ নয়।"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে বউটির উজ্জ্বল মুখ যেন এক লহমায় বর্ষার মেঘের মতো কালো হয়ে এল।

"হল তো? শান্তি হল?" সেই মোটা মহিলাটি সঙ্গে সঙ্গেই টিপ্পনীর সুরে বলে উঠল, "কী লো শিউলি, খুব শহরের মেয়েছেলে দেখে ভাই পাতাতে গেছিলিস, তা-ই না রে? হল তো? মুখে নুড়ো জ্বেলে দিল তো। এইজন্য বলে, বেধবা মেয়েমানুষের লজ্জা-হায়া কিছুই থাকে না।"

কথাটা শোনামাত্রই বীথির নিজের খারাপ লাগল। ইশ্! সত্যিই তো এর তো কোনও দোষ নেই। এইভাবে মহিলাটির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করলেই পারত। কিন্তু সে কী করবে...

ঠিক এমন সময় দরজার কাছে মহিলার ভিড় ঠেলে ওদেরই ফাঁকফোকর গলে বীথির কাছে ছুটে চলে এল একটা বছর সাতেকের ছেলে।

"মা...? মা... জানো? এই বাড়ির পিছনদিকে না একটা বড় পন্ড রয়েছে। আর সেই পন্ডে অনেকগুলো ফিশ রয়েছে। আর... আর.. পন্ডের ওপরে অনেকগুলো ডাক সুইম করছে। আর কতগুলো ট্রি রয়েছে জানো..."

"বউমা, এটাই কি তোমার ছেলে?" ভিড়ের মধ্য থেকে আরেকজন বয়স্ক মহিলাটি কথাটা বলে উঠতেই, পাশের আরেকজন মহিলা তার কানে কানে কী যেন বলে উঠল। বীথি খেয়াল করল, কথাটা শোনামাত্র তার মুখের ভাবের পরিবর্তন হল নিমেষেই।

একটু আগের কমবয়সি বিধবা মহিলাটি বীথির ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলল, "কী নাম তোমার?"

"অগ্নিবেশ সান্যাল। ডাকনাম টুপাই।"

"ভাই, তোমার ছেলেটি ভারী মিষ্টি!" মহিলাটি মিষ্টি করে কথাটা বলে উঠতেই বীথির আত্মগ্লানি অনুভব হল। একটু আগেই মেয়েটিকে কত খারাপ করে কথা শুনিয়েছে। অথচ মেয়েটি...।

বীথি ছেলের মাথায় হাত রেখে বলল, "টুপাই? নতুন জায়গায় এসেছ। সকলকে 'হাই' বলেছ?"

টুপাই মায়ের কথামতো ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে হাত নেড়ে হাই জানাতেই সেই অল্পবয়সি বিধবাটি ঝুঁকে টুপাইয়ের কপালে একটা স্নেহের চুম্বন এঁকে দিল। আর ঠিক এমন সময়ই দরজার পিছন থেকে একটা পুরুষকণ্ঠ ভেসে এল, "পিসিমা? পিসিমা কি এই ঘরে আছেন?"

পুরুষ কণ্ঠস্বর শুনে দরজা ঘিরে-রাখা মহিলারা দু-দিকে সরে গিয়ে মাঝে

একটু রাস্তা ফাঁকা করে দিল যাতায়াতের জন্য। আর ঠিক তখনই দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে এল একজন লম্বাচওড়া বছর বত্রিশের যুবক। নাম সুমেশ সান্যাল। পরনে হাতা-গোটানো, প্যান্টে ইন না-করা চেক শার্ট। গালে কয়েকদিনের না-কামানো খোঁচা খোঁচা দাড়ি। চোখে মোটা কালো ফুল ফ্রেমের চশমা। সুমেশ বীথির দিকে একবার তাকাল। বীথি চোখের ইশারায় সুমেশকে বিছানার দিকে ইঙ্গিত করতেই সুমেশ বুঝতে পারলে, বিছানার ওপর শুয়ে-থাকা রুগ্ণ মহিলাই নিহারিণী মল্লিক। সম্পর্কে তার পিসিমা। সুমেশ ধীরপায়ে পিসিমার পাশে এসে বসল।

"বলি, ও বউ। তোমরা থাকো। আমরা পরে আসব। পরে এসে আলাপ করব, কেমন?"

"আসি গো বউমা।"

"ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে এসো পারলে।" বীথি দেখতে পেল, এইসব কথা বলতে বলতেই দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা প্রমীলাবাহিনীর সকলেই ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ওরা বেরিয়ে যাওয়ার পর, শিউলি এসে বীথির হাতখানা চেপে বলল, "আমরা মফস্সলের মানুষ, ভাই। অত পরিপাটি করে কথা বলতে জানি না। তুমি এদের কথায় কিছু মনে কোরো না।"

বীথি উত্তরে শুধু মুচকি একটা হাসি দিল। হাসি ছাড়া তো তার কাছে কোনও উত্তর নেই। কী বলবে সে একে? এখানকার কিছুই তার ভালো লাগছে না। একে তো এই মফস্সল শহর, তারপর এই ধরনের গায়ে-পড়া লোকজন। যেগুলো সে একদম নিতে পারে না। কোথায় সে স্বপ্ন দেখেছে চিরকাল বিদেশে কাটানোর। আচ্ছা, বিদেশ না হোক, দেশেরই কোনও মেট্রো সিটিতে। হুঃ! কোথায় কী? কপাল তার কোনওকালেই ভালো নয়, তা না হলে তাকে এসে উঠতে হয় এই ছোট্ট একটা মফস্সল এলাকায়? এইভাবে? তবে এই মহিলাটি ভালো। বীথি তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে—এটা দেখেও মেয়েটা শান্ত হয়ে কথা বলছে। মহিলাটি বাকিদের মতো ঘরের বাইরে চলে যেতেই, বীথির দৃষ্টি পড়ল ঘরে উপস্থিত আরেকজনের দিকে।

ঘরেরই এককোণে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বছর আট-নয়ের একটি ছোট্ট মেয়ে। মেয়েটির নাম মুনিয়া। এই বাড়িরই নীচের তলার দুটো ঘর নিয়ে ভাড়া থাকে এক হিন্দুস্থানি পরিবার। মুনিয়া ওদেরই মেয়ে। ওরা আসার পর টুপাই আর মুনিয়ার বেশ ভাব হয়েছে।

"আমায় চিনতে পারছ পিসি? আমি বুলু।" সুমেশ বৃদ্ধার রুগ্‌ণ হাত চেপে বসে রয়েছে। "আমায় চিঠি লিখে তুমি আসতে বলেছিলে। আমি এসেছি, পিসি। এই দ্যাখো, আমি এসেছি। আমায় চিনতে পারছ না?"

"উনি চিনতে পারছেন না। তা ছাড়া আপনাকে তো উনি এর আগে দেখেনওনি।" দরজার সামনে থেকে একটা খসখসে গলার স্বর শুনে, দুজনেই মুখ তুলে দরজার দিকে তাকাল। একজন বছর চল্লিশের মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে। পরনে হলুদ প্রিন্টের ম্যাক্সি। বুকের সামনে লাল রঙের ওড়না দেওয়া। মাথার ভেজা চুল আপাতত খুলে রাখা হয়েছে। চোখে একটা রিমলেস চশমা। বাঁ গালে জড়ুলের মতো একটা ছোট্ট দাগ রয়েছে। দেখেই মনে হচ্ছে, সদ্য স্নান সেরে উঠেছেন।

সুমেশ আর বীথি এঁকে আগেই দেখেছে। বাড়িতে ঢুকে সবার প্রথমে এঁর সঙ্গেই সাক্ষাৎ ঘটেছে তাদের। কিন্তু পরিচয় সারা সম্ভব হয়নি।

"উনি গত এক সপ্তাহ ধরে কাউকেই চিনতে পারছেন না। সম্ভবত ওঁর মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো ধীরে ধীরে কাজ করা বন্ধ করে দিচ্ছে।"

"তাহলে আমায় চিঠিটা কে লিখল?"

"চিঠিটা বেশ কিছু আগের। আমিই লিখেছিলাম। উনিই লিখতে বলেছিলেন। তখন শরীর সুস্থই ছিল মোটামুটি।" মহিলাটির গলার স্বর বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। ঠিক এমন সময়, নিহারিণী দেবীর গলার ভেতর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ বেরিয়ে আসতেই, ওই মহিলা ছুটে এসে কানটা পেতে ধরলেন নিহারিণী দেবীর মুখের কাছে। তারপর খুব মনোযোগ সহকারে কিছু শুনছেন এমনভাবে মাথা নাড়াতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে সোজা হয়ে, নিহারিণী দেবীকে খানিকটা কাত করে শুইয়ে, পিঠটা ভালো করে চুলকে দিলেন।

"আসলে একটানা শুয়ে থাকেন তো, তাই এগুলো খুব চুলকোয়... তখন মাঝে মাঝে..."

"আচ্ছা, আপনি কে হন ওঁর?"

"আমার নাম সুমিতা। আমি ওঁর কেয়ারটেকার। দীর্ঘদিন ধরেই ওঁর দেখাশোনা করছি। আপনারা আগে চিঠি দিয়ে জানালে, ওই ঘরটা পরিষ্কার করে রাখতাম। এমনিতে পরিষ্কারই ছিল..."

"আচ্ছা, এটা তো বেশ মফস্‌সল এলাকা। এখনও এখানে চিঠি লেখার চল রয়েছে? এর চেয়ে বরং আমায় ফোন করে দেওয়া, মেল বা হোয়াট্‌সঅ্যাপে একটা টেক্সট... করে দিলেই হত।"

"হ্যাঁ, কিন্তু ওঁর কাছে আপনার কোনও নাম্বার ছিল না। একটাই মাত্র জিনিস ছিল, সেটা হল আপনাদের বাড়ির ঠিকানা। এ ছাড়া..."

সুমেশ আর মহিলাটি কথা বলছে একে অপরের সঙ্গে।

বীথি ধীরে ধীরে দক্ষিণদিকের জানালার কাছে সরে এল। এইদিকটা বাড়ির পিছনদিক। বেশ গাছপালা রয়েছে বাড়ির পিছনদিকে। বিকেল ঘনিয়ে এসেছে। তাই ঘরে ফেরা পাখিদের কলতানে মুখরিত হয়ে রয়েছে বাড়ির পিছনদিক। উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা হতে চোপড়া পর্যন্ত যে হাইওয়েটা সোজাসুজি বেরিয়ে গিয়েছে শিলিগুড়ির দিকে, সেই হাইওয়েরই পাঁজিপাড়া আর ইসলামপুরের মাঝে একটি জায়গা হল টিকারচুলা। সেই টিকারচুলা হাইওয়ে থেকে দক্ষিণ-পূর্বদিকে গোয়ালপোখর পর্যন্ত একটি প্রধান সড়ক এগিয়ে গিয়েছে। হেমতপুর এই সড়কেরই ধারে অবস্থিত একটি মফস্‌সল এলাকা। আর এই পাড়াটা প্রধান সড়ক থেকে আরও কিছুটা ভেতরে। টুপাই এরই ফাঁকে ছোট মেয়েটির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে গেছে। নিশ্চয়ই চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছে। টুপাই এখানে এসে খুব মজা পেয়েছে। ও-ই বা কী করবে বেচারি? কলকাতার জীবন মানে তো বদ্ধ জীবন। ওখানে এই মুক্ত পরিবেশ কোথায়? ঘুরুক ছেলেটা। জানালার ধারে দাঁড়িয়ে এসবই মনে মনে ভাবছিল বীথি, ঠিক এমন সময় কী একটা খেয়াল করতেই এক মুহূর্তে বুকের ভেতরটা

যেন ধক করে উঠল।

জানালায় দাঁড়ালে পেছনের বাগানের অনেকটা নজরে আসে। বিকেল ফুরিয়ে আসছে। অন্ধকার না ঘনালেও পিছনের বাগানে একটা আঁধার-আঁধার ব্যাপার এসেছে। এরই মধ্যে বীথি দেখতে পেল, ঠিক নারকেল গাছের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি লোক। তার চোখের অপলক স্থির দৃষ্টি বীথির ওপর নিবদ্ধ। সেই দৃষ্টি এক অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আচমকাই বীথি টের পেল, ওর ঘাড়ের লোমগুলো ধীরে ধীরে খাড়া হচ্ছে। কারণ লোকটি আচমকাই তার দিকে তাকিয়ে এক শব্দহীন হাসি হাসছে।

বীথি ঢোঁক গিলল একটা—"সুমেশ... এখানে এসো। কুইক।"

সুমেশ সুমিতা দেবীর সঙ্গে কথা বলছিল। বীথির কাঁপা-কাঁপা কণ্ঠস্বর শুনে সুমেশ খানিকটা ভয় পেয়েই ছিটকে চলে এল জানালার কাছে। ওঁর পিছন পিছন সুমিতা দেবী। বীথির দৃষ্টি অনুসরণ করে, জানালার বাইরে তাকাতেই লোকটিকে দেখতে পেল ওরা দুজনে। অন্ধকার বাগানে দাঁড়িয়ে, লোকটি তখনও ওদের দিকে তাকিয়ে শব্দহীন হাসি হেসে চলেছে।

সুমেশের নিজের অস্বস্তি হচ্ছিল, এইভাবে লোকটিকে হাসতে দেখে। অস্বস্তি ঢাকার জন্য সে খানিকটা কৈফিয়ত চাওয়ার ভঙ্গিতে কিছু বলতে উদ্যত হতেই, সুমিতা দেবী দ্রুতহাতে জানালার পাল্লাটা সশব্দে বন্ধ করে দিলেন। এমনকি পাশের দিকের আরেকটা জানালাও।

সুমিতা দেবীর এরকম কাণ্ড দেখে ওরা দুজনেই অবাক হল। এ আবার কীরকম আচরণ!

"আপনারা ঘরে যান। এতটা পথ এসেছেন, নিশ্চয়ই ক্লান্ত হয়ে রয়েছেন। আমি দেখি, আপনাদের খাবারের ব্যবস্থা করি বরং।" এই কথাটা বলতে বলতেই সেই ছোট মেয়েটি আর টুপাই ফিরে এল বাইরে থেকে। কথাটা বলেই সুমিতা দেবী বেরিয়ে যাচ্ছিলেন রুম থেকে, ঠিক এমন সময় বীথি প্রশ্ন করে বসল, "আপনি জানালার পাল্লাটা ওভাবে বন্ধ করে দিলেন কেন?"

সুমেশ এই ব্যাপারে কিছু না বললেও, বীথি সুমিতা দেবীর আচরণে বেশ

বিরক্ত।

"সন্ধ্যা হয়ে আসছিল তো। মশা ঢুকত। তাই..."

"আপনি কিছু লুকোচ্ছেন তা-ই না...?" বীথি যেন নাছোড়বান্দা। "আপনি লোকটিকে দেখে পাল্লাটা লাগালেন। কিন্তু কেন?"

সুমেশ দেখল, বীথির শেষের প্রশ্ন দেখে এক মুহূর্তের জন্য হলেও সুমিতা দেবীর মুখের ভাবটা কেমন যেন বদলে গেল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বলে উঠলেন, "সবে তো আজকে এলেন। নতুন এসেছেন তাই কৌতূহল বেশি। এসেছেন, বিশ্রাম নিন। এরপর তো এখানেই থাকবেন। সব ধীরে ধীরে জানতে পারবেন।"

সুমিতা দেবীর বাচনভঙ্গি বীথির পছন্দ হল না। কেমন রহস্যে ভরা কথাগুলো।

"কে ওই লোকটা?"

"যাকে জানালার বাইরে দেখলেন? পাগল একটা। তবে ও আসে।"

"আসে মানে?"

"সব জায়গারই কিছু না কিছু রহস্য থাকে, ম্যাডাম, যাকে যুক্তি দিয়ে অন্তত বিচার করা যায় না। অন্য সময় ওকে দেখা যায় না। তবে ও মাঝে মাঝে আসে। এই এলাকায় যখন কেউ মরতে বসে, তখন ও আসে। ওর আসা মানেই এটা ধরে নেওয়া হয় যে, কেউ মরতে চলেছে। আর যে বাড়িতে আসে, সেই বাড়ির মৎস্যমুখের ভাত খেয়ে তবেই ফেরত যায়। অর্থাৎ সেই বাড়ির কেউ না কেউ মারা যায়। এখানেও কয়েকদিন ধরেই আসছে। বাড়ির আশপাশে ঘুরছে। আশা করি, আপনারা সবটা বুঝতে পেরেছেন।"

বীথি খানিকটা রিল্যাক্স হওয়ার ভঙ্গিতে মুখ থেকে হাওয়া ছাড়ল, "এই কথা? আর আমি ভাবছি কী না কী? সুমেশ, ডোন্ট ওরি! এরকম আরও অনেক গল্প ধীরে ধীরে শুনতে পাবে।" বীথির কথাটার মধ্যে গ্রাম্য মানসিকতাকে তাচ্ছিল্য করবার একটা ভঙ্গি ছিল।

"গল্প কি না জানি না, ম্যাডাম।" সুমিতা দেবীর চোখ মেঝের দিকে নিবদ্ধ, একদৃষ্টিতে কী যেন ভেবে চলেছেন আনমনে—"তবে এখানকার লোকে ওকে বিশ্বাস করে। সকলে এ-ও বিশ্বাস করে, সব সময় ও একলা আসে না। কৃষ্ণপক্ষে ও যখন আসে, তখন আরেকজন ওর সঙ্গে সঙ্গে আসে..."

"ওর সঙ্গে? কে আসে...?" বীথি সন্দিগ্ধ চোখে তাকাল সুমিতার দিকে।

সুমিতা দেবী সে কথার উত্তর দিলেন না। তার বদলে বীথির মুখের দিকে তাকিয়ে শুধু একটা মুচকি হাসি হাসলেন।

(২)

অমুয়ো

পাড়াটা দেখতে যে-কোনও মফস্‌সল এলাকার পাড়ার মতোই। ঝকঝকে রাস্তা। রাস্তার দুইপাশে বিদ্যুৎবাতি, কেব্‌ল লাইন। প্রধান রাস্তা থেকে বেরোনো শাখাপ্রশাখা রাস্তা। আর সেই রাস্তাগুলোর পাশে দাঁড়িয়ে-থাকা একতলা, দোতলা পাকা বাড়ি। শুধু পার্থক্য বলতে, এখানের প্রত্যেকটা বাড়ি অনেকটা জায়গা নিয়ে গড়ে-ওঠা। সেই জায়গা ঘিরে সবুজের সমারোহ। হ্যাঁ, এই এলাকায় গাছপালার আধিক্য চোখে পড়বার মতো। দোতালার বারান্দার এককোণে একটা সোফা পাতা। সোফার সামনে টি-টেবিল। টি-টেবিলে রাখা একটা এঁটো চায়ের কাপের ওপর মাছি ভনভন করছে। সুমেশ একটা সিগারেট ধরিয়ে খবরের কাগজটা খুব যত্ন সহকারে পড়ছে। যেন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনও খবর।

"কী? কিছু বেরিয়েছে নাকি?"

কানের পিছন থেকে আচমকা কথাটা শুনতে পেয়েই চমকে উঠল সুমেশ। বীথি কখন যে ঘুম থেকে উঠে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সে টের পায়নি।

"বাপ রে! ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে তো একেবারে।"

"মর্নিং!" বীথি কোনওরকমে সুমেশের পাশে এসে বসল। চুলগুলো এলোমেলো হয়ে রয়েছে তার। মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, চোখে এখনও তন্দ্রা রয়েছে। আরেকটু ঘুমোতে পারলে ভালো হত।

"ঘড়িতে দশটা বাজে।"

"হ্যাঁ, তো?"

"তো... এটা কলকাতা নয়। এটা হেমতপুর। একটা মফস্‌সল এলাকা। এখানে কেউ এত দেরি করে ঘুম থেকে ওঠে না। বিশেষত মেয়েরা তো নয়ই।"

বীথি সেই কথার জবাব না দিয়ে ধীরে ধীরে উঠে দোতলারই এক প্রান্তে থাকা টয়লেটের দিকে এগিয়ে গেল। টয়লেট থেকে ফ্রেশ হয়ে যখন বীথি বেরোল, তখন দেখল, সুমেশের চায়ের কাপের পাশে এক কাপ গরম চায়ের সঙ্গে কিছু বিস্কুট রেখে গিয়েছে কেউ।

চা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিতেই নিমেষে সকালের তন্দ্রাভাব কোথায় যেন কেটে গেল তার।

"টুপাইকে তোলো। কতক্ষণ ঘুমোবে! অনেকটা বেলা হয়েছে তো।"

"হুম। তুলব। পেপারে কিছু দিয়েছে?"

বীথির প্রশ্নে সুমেশ ঘাড় নাড়াল। "উঁহু, এখনও তো পাইনি। আমিও সেরকম খুঁজছি।"

"না দিলেই মঙ্গল। অবশ্য ওদেরও ভয় আছে। পেপারে দেবার মতো এতটা পাবলিক করবে না মনে হচ্ছে। আফটার অল, ওরা যেটা করেছে, সেটা তো কোনও লিগাল ওয়েতে করেনি। সরকারের চোখ এড়িয়ে এত এত টাকার সুদের ব্যাবসা। নেহাত আমাদের প্ল্যানটা ভরাডুবি হয়েছে তাই। না হলে..."
বীথির বাকি কথাগুলো কানে যাচ্ছিল না সুমেশের। সে ধীরে ধীরে স্মৃতির অতলে প্রবেশ করছে যেন...

দীর্ঘদিন চাকরির চেষ্টায় ব্যর্থ হওয়ার পর, সুমেশ একের পর এক ব্যাবসায়

নিজেকে ঠেলেছে। কিন্তু সেরকমভাবে কখনোই উতরে উঠতে পারেনি। ব্যাবসায়িক স্বার্থে একের পর এক ঝুঁকি নিয়েছে, আর বলাই বাহুল্য, সেই ঝুঁকির মূল্যও দিতে হয়েছে তাকে। সম্পত্তি বন্ধক দিতে দিতে একসময় নিঃস্ব হয়েছে, কিন্তু তারপরেও ধারকর্জ করা ছাড়তে পারেনি। এমনও হয়েছে, মহাজনের লোকেরা বাড়ি বয়ে এসে হুমকি থেকে শুরু করে মারধর পর্যন্ত করেছে। ঠিক এইরকমই এক সঙ্গিন অবস্থায় মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘায়ের মতো হাজির হয় নতুন এক বিপদ। এলাকার ছোটখাটো ডন গোছের লোকের থেকে বেশ অনেকগুলো টাকা ধার করে ব্যাবসার কাজে লাগিয়েছিল সুমেশ। আর ঠিক তার পরপরই লোকটি কী একটা পুরোনো খুনের কেসে ফেঁসে জেলে চলে যায়। কেস চলছিল বেশ কয়েক বছর। সুমেশ ভেবেছিল, লোকটা জেলে চলে যাবে। তখন আর এর ধার-করা টাকা পরিশোধ করতে লাগবে না। কিন্তু সুমেশের কপালের দোষে লোকটি দীর্ঘদিন পরে জামিন পেয়ে জেলের বাইরে বেরিয়ে আসে। আর তার বাইরে আসার পরই, সুমেশের গ্রহের শনির ফের চালু হয়। এমনও হয়েছে, লোকটির ভয়ে সুমেশকে রাতের পর রাত ঘরের বাইরে তালা দিয়ে থাকতে হয়েছে। ঘরের আলো নিবিয়ে রাতের আঁধারে চুপ করে বসে থাকতে হয়েছে। সে-সব দিন যে কী প্রবল আতঙ্কে কাটিয়েছে সুমেশ, আজকে এসে কল্পনা করলেও কেঁপে ওঠে মনে মনে।

ঠিক এরকমই যখন একের পর এক ধারকর্জের অগাধ সমুদ্রের মধ্যে ডুবে যেতে বসেছিল সুমেশ, ঠিক তখনই খড়কুটোর মতো, একদিন দুপুরে তার বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি এসে পৌঁছোয়। চিঠির বয়ানটা ছিল ঠিক এইরকম—

স্নেহের বুলু,

পত্রের প্রথমেই তুমি আমার ভালোবাসা নিয়ো। আশা করি, তুমি ও তোমার বাড়ির সকলে ভালোই আছ। আমি নিশ্চিত, এই চিঠি পেয়ে তুমি অনেকটাই অবাক হয়েছ? ভাবছ নিশ্চয়ই, আজকাল এমন কে রয়েছে, যে তোমায় চিঠি

লিখবে? কিন্তু তোমায় চিঠি লেখা ছাড়া আমার তো আর কোনও উপায় ছিল না তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করবার। আমি শুধুমাত্র এই বাড়ির ঠিকানাটুকুই মনে রাখতে পেরেছি। তোমার বাবা যখন এই নতুন বাড়িটি কেনেন, তখন তিনি চিঠিতে এই ঠিকানা আমায় জানিয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, কোনওদিন যদি কলকাতা যেতে পারি, তাহলে তাঁর সঙ্গে যেন দেখা করি। আমি জানি না, তোমার পিসিমাকে তোমার মনে রয়েছে কি না? মনে না-পড়ারই কথা। দেখা আর পেয়েছি কোথায়? যা শুনেছি, তা তোমার বাবার চিঠির বর্ণনায়। সেই চিঠির আদানপ্রদান তোমার বাবার মৃত্যুর পর অনেককাল আগেই ঘুচেছে। কম বয়সে আমি একজনকে ভালোবেসে ঘর ছেড়েছিলাম। তারপর থেকেই বাপের বাড়ির সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক আমার ঘুচে যায়। হয়তো সন্তান হয়ে নিজেদের বাবা-মায়ের চোখের জলের কারণ হয়েছিলাম বলেই, আমার কপালে কখনও সন্তানসুখ লেখা হয়নি। তোমার পিসেমশাই অনেক টাকা কামিয়েছেন। বিশাল সম্পত্তি গড়েছেন। কিন্তু ভোগ করবার কাউকে রেখে যেতে পারেননি। তাই শেষ বয়সে এসে যক্ষের মতো আমায় এগুলো আগলাতে হচ্ছে।

তোমায় এই চিঠি লেখা একটি বিশেষ কারণে। কথায় বলে, মানুষের শেষ সময় আগত হলে শরীর নানানভাবে জানান দেয়। আমিও ইদানীং শরীরের এই সাড় টের পাচ্ছি। বুঝতেই পারছি আমার হাতে সময় আর খুব বেশি নেই। খুব তাড়াতাড়িই হয়তো এই পৃথিবীর মায়া কাটাব। কিন্তু আমি চাই না আমার মৃত্যুর পর আমার সৎকার হোক এমন কারও হাতে, যার সঙ্গে আমার কোনও রক্তের সম্পর্ক থাকবে না। তাই আমি চাই, মৃত্যুকালে তুমি আমার মুখে শেষ জলটুকু তুলে দিয়ে আমার মুখাগ্নিসহ পারলৌকিক বাকি কাজগুলো সমাধা করো। আমি জানি, পৃথিবীর প্রত্যেকটা কাজের মূল্য রয়েছে। এমনি এমনি কিছুই হয় না। তোমারও কাজের মূল্য রয়েছে। তুমি যদি আমার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করো, তাহলে আমার যাবতীয় সম্পত্তি আর অর্থের একমাত্র উত্তরাধিকারী হবে তুমি। তুমি এই প্রস্তাবে রাজি থাকলে, উক্ত

ঠিকানায় চিঠি দিয়ে জানিয়ো, কবে আসছ। তোমার চিঠির উত্তর পেলে তবেই আমি আমার উইলখানা বদলাব। এই চিঠি পেয়ে যদি আসার সিদ্ধান্ত নাও, তাহলে বলব, দেরি কোরো না। জীবনের শেষ মুহূর্তটুকু পরিবারের সঙ্গে কাটাতে মন চাইছে। হোক-না সেই পরিবার দূর সম্পর্কের। পরিবার তো। ভালোবাসা নিয়ো।

ইতি–

পিসিমা (নিহারিণী মল্লিক)

চিঠিটা হাতে পেয়ে প্রায় থম মেরে বসে ছিল সুমেশ। এইরকম পরিস্থিতিতে সে এর আগে পড়েনি। তার প্রায় এই কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করে তার স্ত্রী বীথি। এইসব ব্যাপারে বীথির বুদ্ধি বেশ কাজে লাগে, সেটা আগেও দেখেছে সুমেশ। বীথির পুরো নাম নীপবীথি। সে সুমেশের চেয়ে বড়। সুমেশের সঙ্গে বীথির এটি দ্বিতীয় বিয়ে। প্রথম পক্ষের সন্তান টুপাইকে রেখে বীথির স্বামী মারা যায় বছরকয়েক আগে। তারপর থেকে বীথি একলাই ছিল। সুমেশের সঙ্গে বীথির সোশ্যাল সাইটে আলাপ। আলাপ থেকে প্রণয়। প্রণয় থেকে বিয়ে।

বীথির পরামর্শেই সুমেশ চিঠি লিখে হেমতপুরের ঠিকানায় পাঠায়। বীথির পরামর্শেই, পাওনাদারদের চোখ এড়িয়ে, প্রায় লুকিয়ে কলকাতা ছেড়ে, এই হেমতপুরে এসে উঠেছে সুমেশ। এক নতুন কিছু শুরুর আশায়। কপালে থাকলে এখানে থাকা হবে, না হলে অন্য কোথাও। পিসিমার যা অবস্থা দেখেছে, যে-কোনও মুহূর্তে প্রাণপাখি উড়ে যেতে পারে। তেমন হলে, নইলে একবার সম্পত্তি হাতে চলে এলে, তখন নইলে বিক্রি করে কলকাতাতেই ফিরে যাবে। এ আর এমন কী ব্যাপার?

"এখানকার লোকেরা একটু বেশিই গায়ে-পড়া," চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কথাটা বলল বীথি, "আমাদের খুব একটা বেশি দিন এখানে থাকা চলবে না।"

"হ্যাঁ, জানি। দ্রুত এখানকার কাজ শেষ করতে হবে। মোটামুটি যা প্রপার্টি দেখতে পাচ্ছি, বিক্রি করলে মোটামুটি ধারদেনা শোধ করেও অনেকটা টাকা বেঁচে যাবে। আমরা নতুন করে সব কিছু শুরু করতে পারব।"

কথাটা বলতে বলতে কেমন একটা ঘোরের মধ্যে চলে গিয়েছিল সুমেশ। আচমকা খিকখিকে হাসি শুনে, তার যেন চমক ভাঙল।

বীথি হাসছে। মুখে একটা তাচ্ছিল্যের হাসি।

"কী ব্যাপার? হাসছ কেন?"

"তুমি করবে নতুন করে শুরু...? হা হা!" আচমকা হাসি থামিয়ে মুখটা কঠিন হয়ে যায় বীথির, "তুমি জীবনেও কিছু নতুন করে শুরু করতে পারবে না, সুমেশ। এটা তোমার প্রকৃতি হয়ে গিয়েছে। তোমার লোভ, তোমার লোভ আবার তোমায় সেই নোংরায় টেনে নামাবে। তুমি আবার নতুন কোনও ব্যাবসার দিকে ঝুঁকবে, আবার নতুন করে ব্যর্থ হবে। তুমি থামবে না। কারণ তুমি একটা... একটা নির্লজ্জ মানুষ।"

কথাটা বলেই সজোরে আধখাওয়া চায়ের কাপটা প্লেটের ওপরে রেখে বীথি আর এক মুহূর্ত না বসে ঘরের মধ্যে হুড়মুড় করে ঢুকে গেল। আর সুমেশ হাঁ হয়ে তার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল।

* * * * * * * * * * *

"এখানে একটা জিনিস খেয়াল করেছ? বেশির ভাগ বাড়ির সামনে কেমন একটা করে লাল পতকা ঝুলছে। Is it any kind of symbolic?" বীথির প্রশ্নে সুমেশ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে নিজেও খেয়াল করেছে জিনিসটা। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ির বাইরে, ঈশানকোণ বরাবর একটা করে ব:াশের খুঁটি, আর খুঁটির মাথায় পতাকার সাইজে এক টুকরো লাল কাপড় বাঁধা। সে নিজেও এর অর্থ উদ্ধার করতে পারেনি। পাড়ার মহিলারা মিশুকে

হলেও, পুরুষদের এই ব্যাপারে আগ্রহ কমই দেখেছে। দু-দিন হল সে চলে এসেছে। পিসিমার শরীরের অবস্থা গতকালের তুলনায় আরেকটু খারাপ হয়েছে।

মেন রোড ধরে কী সব নাকি কনস্ট্রাকশনের কাজ হচ্ছে, তাই বিকেলের পর এই রাস্তায় গাড়ি চলাচল বন্ধ। বীথি আর সুমেশ হাঁটতে বেরিয়েছে পাড়ার রাস্তায়। মেন রোড থেকে পাড়ার দিকে এগিয়ে-আসা রাস্তাটা প্রথমদিকে একটু ফাঁকা-ফাঁকা। বাড়িঘর তেমন নেই বললেই চলে। একপাশে একটা খেলার মাঠ রয়েছে, সেখানে ছেলেরা ফুটবল খেলছে। টুপাই বাড়িতে মুনিয়ার সঙ্গেই রয়েছে। ভালো বন্ধুত্ব হয়েছে দুজনের। আসলে বাড়িতে থাকলে নানান ব্যাপারে কথা বলা একটু চাপের ওদের। সুমিতা দেবী আশপাশেই থাকেন। নিজেদের গোপন কথা তাঁর কানে ওরা দুজন কেউই তুলতে চাইছে না। তাই হঠাৎ করেই এই ইভনিং ওয়াকের পরিকল্পনা।

"হতে পারে। আমি ভেবেছিলাম, কয়েকজনকে জিজ্ঞাসা করব। কিন্তু আর করা হয়ে ওঠেনি।"

আশপাশের টুকটাক লোকজনের চলাফেরা রয়েছে। কয়েকজন মহিলা দল বেঁধে উলটোদিক থেকে আসছেন। বোধহয় হাঁটতে বেড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন মহিলাকে বীথি চিনেছেন।

"কী বউমা? হাঁটতে বেরিয়ছ?"

বীথি স্মিত হেসে মাথা নাড়াল।

"সন্ধে হয়ে এল তো। আর ওদিকে যেয়ো না তোমরা। এয়োস্ত্রী। স্বামী-সন্তান নিয়ে ঘর। তায় আবার চুল খোলা। কোথায় কী বিপদ হয়। চলো, ফিরে চলো।"

বীথি সেই উত্তরেও কেবল একটা হাসি দিল। তারপর বলল, "আপনারা যান। আমরা আসছি।"

"সেদিন কার সঙ্গে নাকি খারাপ ব্যবহার করলে? তারপরেও তো দেখছি,

লোকজন ভালোই চিনেছে তোমায়।" বীথি সেই প্রশ্নের জবাব দিল না। বরং খানিকটা শীতল স্বরে বলে উঠল, "আমি সেসব নিয়ে ভাবছি না। উম... একটু আগেও বুড়ির যা অবস্থা দেখলাম, বেশ খারাপ। আমার মনে হয় ওকে সরকারি হসপিটালে দেওয়া উচিত।"

"হসপিটালে? কেন?" সুমেশের প্রশ্নে বীথি বলে উঠল, "বুড়ি যদি সরকারি হসপিটালে মারা যায়, তাহলে বুড়ির মৃত্যুটা কোথাও গিয়ে সরকারি অথরাইজেশন পাবে। আর ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়াটা সোজা হবে।"

"তাতে করে আমাদের কী লাভ?"

"লাভ? লাভ তো রয়েছে। একটা কথা মাথায় রাখো, তুমি কিন্তু বুড়ির নিজের সন্তান নও। হিসেবমতো এ সম্পত্তি তোমার পাওয়ার কথা নয়। বুড়ির মৃত্যু সরকারি দিক থেকে কোথাও গিয়ে একটা লিগাল পথ ধরে এগোলে, ভবিষ্যতে সম্পত্তি ট্রান্সফারের যে আইনি কাজকর্ম, সেই ঝামেলায় সেটা কোথাও গিয়ে একটু সুবিধে পাবে।"

সুমেশ মনে মনে বীথির চিন্তাধারার প্রশংসা না করে পারল না। মেয়েটার মাথায় সত্যিই বুদ্ধি রয়েছে। আর বাস্তব জ্ঞানও মোটামুটি টনটনে। শুধু এখন নয়। এর আগেও এই ব্যাপারে বহু প্রমাণ পেয়েছে।

"কী দাদা? কোথায় যাচ্ছেন?"

পিছন থেকে একটা পরিচিত কণ্ঠের ডাক পেয়ে পিছন ঘুরল সুমেশ। দেখা গেল, একটা বাইক রাস্তার উলটোদিকে ঠিক ওদেরকে ছাড়িয়েই দাঁড়িয়ে রয়েছে। বাইকের ওপরে যিনি বসে রয়েছেন, তাঁর চেহারা বেশ বলিষ্ঠ।

ভদ্রলোককে দেখেই একটা হাসি খেলে গেল সুমেশের মুখে—"আরে দাদা। এই তো একটু গিন্নিকে নিয়ে হাঁটাহাঁটি করতে বেরিয়েছি।" কথাটা বলতে বলতেই সুমেশ আর বীথি রাস্তা ক্রস করে বাইকের কাছাকাছি চলে এল।

বীথি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সুমেশের দিকে। সুমেশের এরকম হুটহাট

লোকেদের সঙ্গে মিশে যাওয়ার ক্ষমতা রয়েছে বটে। কিন্তু এত দ্রুত...

"ইনি এখানকার থানার পুলিশ অফিসার। নাম অপরেশ মাইতি। মাত্র দশ দিন হল সামনের থানায় পোস্টিং হয়েছেন। বাড়ি আমাদেরই ওইদিকে। হাওড়ার ডোমজুড়ে। আজ সকালে যখন বাজার করতে গেলাম, তখনই এঁর সঙ্গে সিগারেট খেতে গিয়ে পরিচয় হয়েছে। দারুণ মানুষ।"

"নমস্কার দাদা!"

"নমস্কার বউদি। ভালো আছেন তো?"

"হ্যাঁ, ভালো আছি।"

"একদিন আসুন-না আমার বাড়িতে। এই যে রাস্তাটা দেখছেন, এটা ধরে সোজা না গিয়ে ডানদিক বরাবর এগোলে নিবেদিতা পল্লি। ওখানে গিয়ে নতুন পুলিশের বাড়ি বললে যে কেউ চিনিয়ে দেবে। আসলে কী বলুন তো, অপরিচিত জায়গায় নিজের দেশের লোক দেখলে ভালোই লাগে। আমার স্ত্রী লাবণ্য বেশ বোর হয় এখানে। আপনি এলে বেশ ভালো লাগবে ওর..."

"অবশ্যই যাব। এরপর যখন এখানেই থাকা, যাওয়া-আসা তো লেগেই থাকবে।" তারপর আচমকা কী একটা মনে পড়তেই বীথি সুমেশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, "আচ্ছা, ওঁকে অ্যাম্বুলেন্সের কথাটা বললে হয় না?"

"অ্যাম্বুলেন্স?" অপরেশবাবু অবাক চোখে তাকালেন সুমেশের দিকে।

"হ্যাঁ, ওই সকালে বললাম না পিসিমার ব্যাপারে। ওঁর শরীরটা একটু বেশিই খারাপ। ভাবছিলাম, ওঁকে সন্ধ্যার পরে পরে একটু হসপিটালাইজ করব।"

"বেশ তো, অসুবিধে কী আছে? আমার পরিচিতি রয়েছে। আমি বরং ফোন করে পাঠিয়ে দিচ্ছি আপনাদের ওখানে। ক-টা নাগাদ?"

"এই ধরুন আটটা।"

"বেশ। বেশ। তাহলে এখন চলি। পরে দেখা হবে। বউদি এলাম... চিন্তা করবেন না। অ্যাম্বুলেন্স পৌঁছে যাবে সময়ে। আর সময় করে একবার বাড়ির দিকে আসবেন।"

কথাটা শেষ করে, হুস করে বাইক নিয়ে বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক।

"কী ব্যাপার... আমায় তো কিছুই জানাচ্ছ না আজকাল। পুলিশ-টুলিশের সঙ্গে বন্ধুত্ব..."

কথাটা বলতে গিয়েই আচমকা থমকে গেল বীথি। সূর্য ডুবেছে অনেকক্ষণ হল। চারদিকে আলো কমে এসেছে অনেকটাই। ওরা এখনও পাড়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে, কিন্তু হঠাৎ করেই একজন লোকও দেখা যাচ্ছে না সামনের রাস্তায়। যেন কোনও এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে লোকজন উবে গিয়েছে হঠাৎ করেই। ওদের সামনাসামনি মেন রোডটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে, অন্যদিন হলে হুসহাস করে গাড়ি বেরিয়ে যেতে দেখা যেত। আজ সেসবও নেই।

কিন্তু বীথির কথা বলতে বলতে আচমকা এইভাবে থমকে যাওয়াটা এইসব কিছু দেখে নয়। সুমেশ বীথির দৃষ্টি অনুসরণ করে যা দেখল, তাতে ক্ষণিকের জন্য হলেও, তার বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। তাদের থেকে ঠিক হাত পঞ্চাশেক দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা শরীর। নিজের পায়ে নয়। পায়ের নীচে লম্বা লাঠির মতো অংশ। খানিকটা আগেকার দিনের রণপা গোছের। নাকি রণপাই ওইটা? আজকাল কেউ এই জিনিস ব্যবহার করে, এই প্রথম জানল ওরা। কী অদ্ভুতভাবে, দুটো লাঠির ওপর শরীরের সমস্ত ভার ধরে রেখেছে শরীরটা। বয়স বড়জোর চল্লিশ। মাথায় চুলের বোঝা। পরনে কালো খাটো ধুতি। গলায় উত্তরীয় গোছের এক মলিন কালো কাপড়। কোমরে একটা কাটারির মতো কিছু গোঁজা। নাক আর ঠোঁটের ওপর কালো কাপড়ের ফেট্টি। দৃশ্যমান বলতে শুধুমাত্র নাকের ওপরের অংশ আর দুই চোখ। সেই দু-চোখেও যে বিস্ময় তা সহজেই ধরা পড়ল সুমেশ আর বীথির চোখে।

এই প্রায় অন্ধকারে, ঠিক রাস্তার মাঝবরাবর এরকম কিছু দেখে বীথি ভয় পেয়ে সুমেশের হাতখানা আঁকড়ে ধরল। ছিনতাইবাজ নাকি ডাকাত গোছের কেউ? এখন যদি আক্রমণ করে ওই কোমরে গোঁজা অস্ত্র দিয়ে তাহলে ওরা ওকে আটকাবে কী করে? কিন্তু আচমকা ওদের অবাক করে দিয়ে লোকটি

আচমকা পিছন ঘুরে দৌড় লাগাল। লম্বা লম্বা কাঠের পা ফেলে চোখের নিমেষে দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল শরীরটা। এরকম একটা দৃশ্যের জন্য ওরা দুজনেই মোটেও প্রস্তুত ছিল না। খানিকটা সময় লাগল ধাতস্থ হতে।

"ফিরে চলো। আমার ভালো লাগছে না।"

"কী হয়েছে?" সুমেশ উদ্‌বিগ্ন মুখে বীথির দিকে তাকাতেই বীথি বিড়বিড় করে বলে উঠল, "জানি না। ওই লোকটাকে দেখবার পর থেকেই..."

কথাটা শেষ না করেই বীথি ফেরার পথ ধরল। বীথির আচরণে সুমেশের কপালের ভাঁজ গাঢ় হল। বীথির আবার আচমকা কী হল?

"তা, তোমরাই বুঝি মল্লিকদের বাড়িতে এসে উঠেছ?"

পাড়ার মধ্যে ওরা দুজনেই ঢুকে পড়েছে অনেকক্ষণ। বাড়ি হাত পঞ্চাশেক দূরেও নয়। পাড়ার মুখেই একটা মুদিখানার দোকান রয়েছে। টিমটিম করে তার সামনে সাদা একটা হলুদ বাল্‌ব জ্বলছে, যার আলো কিছুটা রাস্তায় কিছুটা দোকানের সামনে ছড়িয়ে পড়েছে। আজ রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে না। ফলে সারা পাড়া জুড়েই একটা অন্ধকার-অন্ধকার ব্যাপার। বীথি এই দোকানে ঢুকেছে কিছুক্ষণ আগেই। টুকটাক তার প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস কিনতে। দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেটের ধোঁয়া ওড়াচ্ছিল সুমেশ। চোখের দৃষ্টি দূরের অন্ধকারে নিবন্ধ। আনমনে কিছু বেখেয়ালি ভাবনায় যখন সে প্রায় মশগুল, ঠিক এমন সময় পিছন থেকে এই কথা শুনে চমকে উঠল সুমেশ।

সে দেখল, ওর ঠিক পিছনেই সাইকেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক বয়স্ক ভদ্রলোক। গোলগাল, লম্বাচওড়া, ফরসা চেহারা। মাথায় টাক। কানের আশপাশে কিছু চুল রয়েছে বটে, তবে তা ধরার মধ্যে নয়। ইতিমধ্যেই দোকান থেকে জিনিসপত্র নিয়ে বেরিয়ে এসেছে বীথি।

"হ্যাঁ, আমরাই উঠেছি।"

"তা, তুমিই বুঝি মল্লিকবউদির ভাইপো?" কথাটা বলেই ভদ্রলোক বীথির দিকে তাকালেন। "তোমরা যেদিন এলে, আমার মিসেস ও বাড়ি গিয়েছিলেন

বটে, তবে আমার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। তা ভালো আছ তো তোমরা?"

"হ্যাঁ, ভালোই আছি।"

"তা কেমন লাগছে এই মফস্‌সল? নিশ্চয়ই ভালো লাগছে না তা-ই না?" কথাটা বলতে বলতেই ভদ্রলোক হেসে উঠলেন। সুমেশ সেই হাসির রেশ ধরে বলল, "নাহ্। নাহ্। এমন কোনও ব্যাপার না। এমনিতে তো সব ঠিকঠাকই। সুন্দর পরিবেশ। মানুষজনও বেশ মিশুকে। শুধুমাত্র এই বিকেলের পর এমন একটা জিনিস হল যে, তারপর থেকেই একটা অস্বস্তি হচ্ছিল, যেটা আপনার সঙ্গে কথা বলবার পর কেটেও গিয়েছে।"

সুমেশের কথা শুনে ভদ্রলোক একটু অবাক হলেন, "বিকেলের পর? কী হয়েছে? কেউ কিছু বলেছে?"

"না না। কেউ কিছু বলেনি," এতক্ষণ পরে বীথি মুখ খুলল, "আসলে বিকেলের দিকে আমরা একটু হাঁটতে বেরিয়েছিলাম। ফিরেই আসছিলাম। ঠিক এমন সময় রাস্তায় একজনকে দেখতে পেলাম। তাকে দেখবার পর থেকেই একটা অস্বস্তি হচ্ছিল।"

"কাকে দেখেছ তোমরা?" সুমেশ টের পেল, আচমকাই ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত শীতল হয়ে গিয়েছে।

"নাম জানি না। একটা লোক, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। কালো ধুতির মতো কিছু পরেছিল। মুখে কালো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা ছিল। আর দুটো লম্বা লাঠির ওপর ব্যালেন্স করে হাঁটছিল। এই এলাকায় এমন কাউকে আপনারা..."

বীথি কথাটা শেষ করতে পারল না। তার আগেই দড়াম করে একটা শব্দ। ভদ্রলোকের হাত থেকে সাইকেলটা পড়ে গেল কথাটা শোনামাত্র। শুধু কি তা-ই? ভদ্রলোক যেন থরথর করে কাঁপছে।

"এ কী? কাকু? আপনি ঠিক আছেন? আপনি এরকম করছেন কেন?" ভয়ে আঁতকে উঠল বীথি। ওদিকে চিৎকার শুনে মুদির দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছে দোকানদার। সেই সঙ্গে ভেতরে বসে ছিল আরেকজন লোক, লম্বা,

শ্যামলা গায়ের রং, মাথার সামনেটা চুল কম। তিনিই অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন, "কী হয়েছে, দাদা? এরকম করছেন কেন?" ভদ্রলোক সে কথার উত্তর না দিয়ে সুমেশ আর বীথির দিকে আঙুল তুলে বলে উঠলেন, "এ...এ তোমরা কাকে দেখে ফেললে? কাকে?" তারপর তিনি দোকানদারের দিকে ফিরে বলে উঠলেন, "ওরে পুলক। এরা যে অমুয়া দেখে ফেলেছে রে...!"

"কী!" বীথি খেয়াল করল, কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে দোকানদারের মুখও এক নিমেষে ভয়ে সাদা হয়ে গেল। আর পাশে দাঁড়ানো ভদ্রলোকের মুখ বরফ-কঠিন।

"আপনারা এরকম করছেন কেন?", সুমেশের গলা নার্ভাস শোনাচ্ছে। "অমুয়া কে? আর ওদের দেখলেই বা কী হয়েছে?"

"কী হয়েছে? সর্বনাশ হয়েছে। অমুয়াদের মুখ দেখতে নেই। দেখতে নেই ওদের... যারা দ্যাখে ওদের... তাদের সর্বনাশ হয়। এ সর্বনাশ কেউ আটকাতে পারে না। কেউ না।" টাকওয়ালা লোকটি কথাটা শেষ করামাত্রই খুট করে একটা আওয়াজ হল, আর ঝুপ করে লোডশেডিং হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সারা পাড়া জুড়ে নেমে এল কালরাত্রির অন্ধকার...

(৩)

সংঘাত

ছাদে দাঁড়ালে, সামনের পাড়ার অনেকটা অংশ একসঙ্গে দেখা যায়। এই মুহূর্তে পুরো পাড়াটা অন্ধকারের এক চাদরে ঢেকে গিয়েছে। লোডশেডিং হয়েছে প্রায় দেড় ঘণ্টা হলো। হেমন্তের যে নিজস্ব একটা ঠান্ডা থাকে, সেটা কলকাতায় বসে টের পাওয়া যায় না। মফস্সলের দিকে এগোলে অক্টোবরের শেষে গায়ে কিছু পোশাক চাপাতেই হয়। সুমেশ আবার বরাবরের একটু শীতকাতুরে। গায়ে একটা হালকা সুতির চাদর জড়িয়ে, এই মুহূর্তে অন্ধকার

খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে একের পর এক সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে চলেছে।

রাশি রাশি চিন্তা মাথায় স্তূপ হয়ে জমা হয়ে ছিল এতক্ষণ। সিগারেটের ধোঁয়ায় সেই অযাচিত চিন্তাগুলোকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিচ্ছে সুমেশ একটু একটু করে। একটা ঘটনা কীভাবে মুহূর্তে বদলে দিতে পারে পুরো পরিবেশ, তার সাক্ষী আজ সে নিজে। এই অন্ধকারেও ছাদে দাঁড়িয়ে সে, এতক্ষণ তারই কিছু টুকরো-টাকরা নমুনা দেখতে পাচ্ছে। সারা পাড়া অন্ধকারে ঢাকা, কিন্তু ছাদের ওপর থেকে সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সারা পাড়া জুড়ে লোকেরা চুপিচুপি এর-ওর বাড়ি যাতায়াত করছে। চলছে ফিশফিশ করে কথা বলা। মাঝে মাঝে দল বেঁধে এই বাড়ির সামনেও আসছে। কিন্তু পরক্ষণেই যেন আবার সরে যাচ্ছে।

সুমেশ স্পষ্ট বুঝতে পারল, পুরো ব্যাপারটার পিছনে সন্ধ্যার মুখে হওয়া ঘটনাটা দায়ী। অমুয়া না কী যেন একটা নাম বলেছিল, তাদের দেখতে পাওয়া ঘিরে একটা জোরালো আলোচনা চলছে পুরো এলাকা জুড়ে। সে সবটা বুঝতে পারেনি। শুধু এটুকু জেনেছে অমুয়ারা ভীষণ অপয়া কিছু, যাদের নাকি দেখা পেতে নেই। যাদের মুখ দেখলে নাকি চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসে। অমুয়ারা নিজেরাও নাকি এটা জানে। তাই তারা নিজেরাও লোকচক্ষুর আড়ালে থাকে। কেউ দ্যাখে না ওদের। কেউ জানে না ওদের। কিন্তু ওরা রয়ে গিয়েছে না-থাকার মতো করে এই হেমতপুরের কপালে। খানিকটা কোনও মিথের মতো হয়ে। অনেকদিন পরে হয়তো লোকে ওদের কথাও ভুলে যেত, যদি আজকের সন্ধ্যার এই ঘটনাটা না ঘটত। সুমেশ আর বীথি যেন আজকের সন্ধ্যায় সেই ছাইচাপা আগুনকেই অনেকটা উসকে দিল। এবার শুধু দেখবার, যে এই আগুন কাকে কাকে কতটা পোড়ায়। ঠিক এমন সময় পাড়ার মোড়ে একজোড়া হেডলাইটের আলো জ্বলে উঠতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল তাঁদের বাড়ির সামনের দৃশ্যটা।

লোকজন গিজগিজ করছে বাড়ির সামনে। সুমেশ ভয় পেল। বুঝল এরা

সকলেই এই এলাকার লোক। কিন্তু এখানেই বা কী চাইছে এরা? সুমেশ ভালো করে সামনের ভিড়ে লোকজনদের মুখ চেনার চেষ্টা করল। পরে যদি কোনো গণ্ডগোল হয়, দু-একজনকে চিনতে পারবে অন্তত। কিন্তু নাহ্! এই ভিড় বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। হেডলাইটের আলো জ্বলামাত্রই, চোখের নিমেষে বাড়ির সামনের জটলা কোথায় যেন উবে গেল।

ওদিকে গাড়িটা তার বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াতেই সুমেশের হঠাৎ মনে পড়ল, ঠিক আটটার অপরেশবাবুর অ্যাম্বুলেন্স পাঠানোর কথা ছিল। সে চট করে পকেট থেকে ফোনটা বের করে দেখল, ঘড়িতে সময় হয়েছে আটটা দশ। সুমেশ দেরি না করে, দ্রুতহাতে ছাদের দরজাটা ভেজিয়ে দোতলায় নেমে এল।

কলকাতায় খুব একটা ব্যাটারির প্রয়োজন হয় না। কিন্তু মফস্‌সলে ঘনঘন লোডশেডিং হয়। আশ্চর্যের কথা, না এই বাড়িতে, না এই পাড়ার অন্য কোনও বাড়িতে সে ইনভার্টার ব্যাটারি দেখতে পেয়েছে এতক্ষণে।

দোতলার একটি ঘর থেকে এমার্জেন্সির আলো সামনের চওড়া বারান্দায় এসে পড়েছে। সুমেশ সেই ঘরের পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে দেখতে পেল, বিছানার একপাশে বীথি দাঁড়িয়ে রয়েছে। এমার্জেন্সির সাদা আলো তার মুখে এসে পড়ায়, মুখটা অদ্ভুত দেখতে লাগছে। টুপাই মায়ের কোল ঘেঁষে কাঁচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে। এই অন্ধকার পরিবেশ যে তার একটুও ভালো লাগছে না, সেটা ওর মুখ দেখেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

সুমিতা দেবী শেষবারের মতো একবার থার্মোমিটার দিয়ে জ্বরটা মেপে নিচ্ছেন। ঠিক এমন সময়ই সুমেশের ফোনটা বেজে উঠল।

"হ্যালো, হ্যাঁ... আচ্ছা। হ্যাঁ... হ্যাঁ। হ্যাঁ... ঠিক আছে, পেশেন্ট রেডি হয়ে গিয়েছে। আপনি একটু ওয়েট করুন। আমরা আসছি।"

ফোনে কথাটা শেষ করেই সুমেশ বীথির দিকে তাকাল, "অ্যাম্বুলেন্স নীচে ওয়েট করছে। আমাদের বেরোতে হবে... সুমিতা দেবী? পিসিমা তৈরি?"

"হ্যাঁ। তবে জ্বরটা অনেকটা বেড়েছে।" তারপর এক মুহূর্ত থেমে ওই

মহিলা বললেন, "বলছি, ম্যাডামকে কি কোনওভাবেই বাড়িতে রাখলে হত না? আমরা তো সকলেই বুঝতে পারছি, শেষ সময় হয়েই এসেছে। এই সময় গাড়িতে করে এতটা পথ। তারপর আবার বাড়ির বাইরে হাসপাতালে..."

"হ্যাঁ, কিন্তু বাড়িতে তো সবটুকু ফেসিলিটি পাওয়া যাবে না। শরীরটা আরও খারাপ হচ্ছে। এই সময়ও যদি হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়া হয় তাহলে... মানুষটাকে বাঁচানোর জন্য শেষ চেষ্টাটুকু করব না?"

"হ্যাঁ, কিন্তু এইভাবে অ্যাম্বুলেন্সে করে... এতটা। কৃষ্ণপক্ষে বাড়ির বাইরে যদি কিছু হয়ে যায়..."

"কৃষ্ণপক্ষে বাড়ির বাইরে যদি কিছু হয়ে যায়? তাহলে কী হয়েছে?" এতক্ষণ পরে মুখ খুলল বীথি। চোখের দৃষ্টি সরাসরি সুমিতা দেবীর দিকে।

"না মানে, য...যদি মারা যান, বাড়ির বাইরে। ব্যা...ব্যাপারটা ভালো দেখায় না তা-ই না?"

সুমিতা দেবীর কণ্ঠ শুনে সুমেশের মনে হল, উনি আচমকা কথাটা ঘুরিয়ে দিলেন।

"আপনি না পিসিমণির দেখাশোনা করতেন? কিন্তু আপনার কথা শুনে তো সেসব মনে হচ্ছে না। আপনি তো ধরেই নিয়েছেন, উনি মারা যাবেন? দেখুন, এসব বলা বন্ধ করুন। আমার তো মনে হচ্ছে, আপনি ইচ্ছে করেই চাইছেন না, পিসিমণি সেরে উঠুক।"

বীথির কথায় যেন জোঁকের মুখে নুন পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেলেন সুমিতা দেবী।

"সুমেশ, পিসিমাকে পাঁজাকোলে তোলো। আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

সুমেশ আর বীথি এখন কায়মনোবাক্যে এই একটাই জিনিস চায়, নিহারিণী মল্লিকের মৃত্যু। কিন্তু সেটা এখানে নয়। সে মৃত্যু হোক সরকারি হাসপাতালে, যাতে সম্পত্তিলাভের পথে কোনও আনুষঙ্গিক ঝুটঝামেলায় তাদের না পড়তে হয়। যদিও এখন ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া বড় কথা নয়, কিন্তু বীথি কোনও

অযথা ঝুটঝামেলা চাইছে না।

সুমেশ বীথির নির্দেশ মেনে বৃদ্ধাকে পাঁজাকোলে তুলে দ্রুত নীচে নিয়ে এল। অ্যাম্বুলেন্স দাঁড় করানো ঠিক গেটের বাইরেই। ড্রাইভার ঝটপট হাতে পিছনের দিকের দরজাটা খুলে দিতেই সুমেশ দেরি না করে, পিছনদিকের স্ট্রেচারে নিহারিণী দেবীকে যত্ন করে শুইয়ে দিল। সাধারণ অ্যাম্বুলেন্স, তবে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রয়েছে।

"তুমি টুপাইকে নিয়ে বাড়িতেই থাকো। আমি পিসিমাকে হাসপাতালে ভরতি করেই রাতে ফিরব। চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সুমেশের শেষের কথাগুলো ছিল বীথির উদ্দেশে। হাতে এমার্জেন্সি আলো নিয়ে ততক্ষণে গেটের বাইরে রাস্তার ওপর এসে দাঁড়িয়েছিল বীথি। পিছন পিছন সুমিতা দেবী আর টুপাই। মুনিয়ার মা মেয়েকে কোলে নিয়ে গেটের ভেতরেই ছিল।

দ্রুতহাতে গাড়ির দরজা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিল সুমেশ। ড্রাইভারও দেরি করল না। ইঞ্জিন স্টার্ট করাই ছিল, সুমেশ পিছনের দরজাটা লাগাতেই, গাড়ি স্টার্ট করে দিল সে। কিন্তু আচমকাই একটা সজোরে ব্রেক। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়ল।

এই আচমকা ব্রেকের জন্য তৈরি ছিল না সুমেশ। ব্যালেন্স সামলাতে না পেরে ঠোক্কর খেয়ে সামান্য চোট পেল কপালে। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠে কিছু বলতে যাবে, তার আগেই শুনতে পেল।

ড্রাইভার উত্তেজিত হয়ে কাকে যেন বলছে, "কী হল কী কাকা? এইভাবে সকলে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে আছ যে? দেখতে পাচ্ছ না, অ্যাম্বুলেন্সে, পেশেন্ট রয়েছে?"

আচমকা বাইরে থেকে একটা শীতল কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠল সুমেশ। বাইরে থেকে কেউ একজন বলছে।

"এই পেশেন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে কোথাও যাওয়া যাবে না। গাড়ি ঘোরাও।"

"এ কী! এসবের মানে কী? জোর যার মুলুক তার?" কথাটা বলতে বলতেই গাড়ির পিছনদিকের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল সুমেশ। আর নেমে দাঁড়াতেই সামনে দৃশ্য দেখে বুকের ভেতরটা এক মুহূর্তের জন্য থমকে গেল যেন। হেডলাইটের আলো সরাসরি সামনে গিয়ে পড়ছে। আর সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, পুরো রাস্তা জুড়ে গিজগিজ করছে লোকে। পাড়ার সমস্ত লোক রাস্তায় নেমে এসে একটা মানব প্রাচীর যেন গড়ে তুলেছে অ্যাম্বুলেন্সের সামনে। অ্যাম্বুলেন্সকে তারা যেতে দেবে না।

"কী চাই আপনাদের? পথ আটকে অ্যাম্বুলেন্সকে যেতে দিচ্ছেন না কেন? রাস্তা ছাড়ুন।" পিছন থেকে কখন যে বীথি এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তা খেয়াল করেনি সুমেশ। আচমকাই তার গলা পেয়ে এতজনের মাঝে বুকে যেন একটু বল পেল সে।

"ছেলেরা যখন কথা বলছে, তখন বাড়ির মেয়েদের কথা বলতে নেই। তুমি ভেতরে যাও, বউমা।"

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন প্রৌঢ় লোক কথাটা বলতেই যেন প্রচণ্ড রাগে মাথায় আগুন ধরে গেল বীথির। কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই সুমেশ বলে উঠল, "আমি কথা বলছি।"

তারপর সামনে এগিয়ে বাকিদের উদ্দেশে বলল, "হ্যাঁ, বলুন। গাড়ি যেতে দিচ্ছেন না কেন?"

"তোমার পিসিমাকে এই অবস্থায় এখান থেকে নিয়ে যাওয়া চলবে না।"

"মানে?" সুমেশ অবাক—"এ কী ধরনের আবদার?"

"ও দাদা, এত মানে জানতে হবে না। আপনাকে যা বলা হচ্ছে, আপনি তা-ই করুন। যান, ভেতরে যান।" ভিড়ের মধ্যে একটা চ্যাংড়া ছেলে উদ্ধত স্বরে কথাটা বলে উঠতেই, নিজেকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারল না সুমেশ, "ইয়ারকি হচ্ছে নাকি? কী ভেবেছেন? আমি পিসিমাকে নিয়ে ঘুরতে যাচ্ছি? হাওয়া খেতে বেরিয়েছি অ্যাম্বুলেন্সে করে? দেখতে পাচ্ছেন না একটা মানুষের অবস্থা কতটা সঙ্গিন? তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে? নইলে তাকে

বাঁচানো যাবে না।”

“বউঠানের অবস্থা আমরা জানি, বাবা,” পাশ থেকে আরেকজন প্রৌঢ় কথাটা বলে উঠলেন শান্ত স্বরে, “সেইজন্যই তো বলছি, গিয়ে আর লাভ হবে না। অযথা শেষ সময়ে কেন তার শরীরকে ব্যস্ত করা। বরং এই মুহূর্তে যদি পথের মাঝে মারা যায়... আর একবার যদি মড়িক্ষণ শুরু হয়ে যায়, তাহলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।”

“কী ক্ষণ!” প্রবল বিস্ময়ে সুমেশ আর বীথির উভয়েরই গলা থেকে বেরিয়ে এল একই শব্দ।

ওদের প্রশ্নে জায়গাটা আচমকা কেমন যেন থমথমে হয়ে গেল।

“মড়িক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষে মধ্যাহ্নের পর এই জায়গায় কেউ মারা গেলে তাকে মড়িক্ষণ স্পর্শ করে। এক ভয়ংকর অশুভক্ষণ।” ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই কম চুলওয়ালা শ্যামলা ভদ্রলোক, যাকে দোকানের সামনে দেখেছিল, তিনি শান্ত স্বরে বলে চললেন কথাগুলো, “এই সময় মৃতদেহ, বাড়ির বাইরে থাকতে নেই। থাকলে, পুরো এলাকা জুড়ে ভয়ংকর সর্বনাশ নেমে আসে।”

“এইসব কী গালগল্প দিচ্ছেন? এসব কেউ আজকালের যুগে বিশ্বাস করে?”

“কেন? লোকে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না?” আরেকটা কমবয়সি ছেলে পাস থেকে বলে উঠল কথাটা, “লোকে ভালো কিছুর ওপর বিশ্বাস করতে পারলে, খারাপ কিছুর ওপরেও বিশ্বাস করতে পারে। তা-ই না?”

“দ্যাখো বাবা। আমাদের সকলের ভালোর জন্যই বলছি। কোনওরকম হঠকারী সিদ্ধান্ত নিয়ো না। মড়িক্ষণে বাড়ির বাইরে, দেহ থাকলে...”

“আরে দাদা, পিসিমা তো এখনও বেঁচে আছেন।” সুমেশ অস্থির হয়ে উঠল। আপনারা এমন করছেন যেন উনি মারা গিয়েছেন। আমরা আগে থেকে কীভাবে ধরে নিচ্ছি, যে উনি মারা যাবেনই! এমন তো হতেই পারে, হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন।”

"তা যে হবে না, সে আমরা ভালো করেই জানি। পাগলাকে তো দেখেছ। ও যদি কোনও বাড়ির ধারেপাশে আসে, তাহলে বুঝে নিতেই হবে, ওই বাড়ির কেউ না কেউ মরতে চলেছে। আর আজ সন্ধ্যার মুখেই তোমরা স্বামী-স্ত্রী মিলে অমুয়াদের মুখ দেখেছ? ওদের মুখ দেখা মানে চরম সর্বনাশ হওয়া। এক ভয়ংকর বিপদ বারবার তোমাদের দিকে ইঙ্গিত করছে। তাই তোমাদের বলা হচ্ছে..."

এক মধ্যবয়স্ক লোক কথাটা শেষ করতে পারলেন না, তার আগেই বীথি বলে উঠল, "আপনারা রাস্তা ছাড়বেন নাকি আমি পুলিশ ডাকব? আমাদের সঙ্গে এখানকার পুলিশের যে পরিচয় রয়েছে, সেটা এই অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভারদাদাকে জিজ্ঞাসা করলেই বুঝতে পেরে যাবেন।"

"একজন মরণাপন্ন মুমূর্ষু রুগিকে চিকিৎসার সুবিধে নিতে না দিয়ে, পথ আটকে, তাকে ধীরে ধীরে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া—কোথাও গিয়ে খুনেরই শামিল। আপনারা এখুনি যদি পথ না ছাড়েন, তাহলে মড়িক্ষণ আসবে কি না, জানি না। তবে আপনাদের জেলে যাওয়ার ক্ষণ হাজির হবেই। তাই বলছি, পথ ছাড়ুন।"

"ম্যাডাম, ওরা কিন্তু ভুল কিছু বলছে না।" সুমিতা দেবী মিনমিন করে কথাটা বলে উঠতেই ঝাঁজিয়ে উঠল বীথি, "তুমি চুপ করো। তোমায় আমার প্রথম থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল। এখন নিশ্চিত হলাম। তোমায় আমি পরে দেখছি।" কথাটা বলেই সে ঘুরে গেল বাকিদের দিকে—"কী হল, পথ ছাড়বেন নাকি খুনের দায়ে জেলে যাবেন..."

সুমেশ দেখল, বীথির কথায় মন্ত্রের মতো কাজ হল। এলাকার লোকেরা গম্ভীর মুখে একে অপরের দিকে তাকালও। তারপর রাস্তার দু-পাশে সরে গিয়ে মাঝে গাড়ির যাওয়ার পথ করে দিল।

সুমেশ আর দেরি না করে, গাড়িতে উঠতেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি স্টার্ট দিয়ে দিল। দেখতে দেখতেই, গাড়ির আলোটা মোড়ের মাথায় অদৃশ্য হয়ে যেতেই, বীথি দেরি না করে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু ঘরে ঢুকতে যাবে, তার

আগেই হাতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়তেই, পিছনদিকে ঘুরে তাকাল বীথি। প্রথম দিনের সেই মোটা মহিলাটা। রাগে থমথম করছে পুরো মুখটা।

"এটা তুমি ঠিক করলে না, বউমা। এটা তুমি একদম ঠিক করলে না। তোমার জন্য যদি আমাদের কোনওরকম দুর্ভোগের আগুন পোহাতে হয়, ভেবো না সেই আগুন থেকে তুমি নিজেও বাঁচবে।"

(৪)

মড়ার মাথায় নড়ি

"কোন রাস্তাটা সুবিধার ছিল, ভাই? এই রাস্তা। নাকি ওই রাস্তা। দেখে তো মনে হচ্ছে, দীর্ঘদিন সারাই হয়নি এই রাস্তা।" খানাখন্দে ভরা রাস্তায় একটু ঝাঁকুনি খেতেই, ব্যাজার মুখে কথাটা বলে উঠল সুমেশ।

ড্রাইভারের নাম সুবিমল দাস। বাড়ি হুগলির মশাগ্রামে। দীর্ঘদিন ধরে ডালখোলা সরকারি হাসপাতালে অ্যাম্বুলেন্সের সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছে। গোয়ালপোখরে কোনও এক পেশেন্ট পার্টিকে ছাড়তে এসে, অপরেশবাবুর মাধ্যমে এই কলটি পায় সে।

"স্যার, ওটা তো হাইওয়ে। ওটা তো ভালো হবেই। কিন্তু বিকেলের পর ওই রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে না? কী সব রাস্তার কাজ হবে। বাধ্য হয়েই তো এই রাস্তা ধরেছি।" খানিক থেমে সুবিমল বলে উঠল, "আমি এসেছি, যদিও এই পথ ধরেই। কিন্তু যাওয়ার পথে তো এত খানাখন্দ তো চোখে পড়েনি।"

"একটু সাবধানে, চলো বুঝলে। বুঝতেই তো পারছ পেশেন্টের অবস্থা..."

ঠিক এমন সময় খপ করে কেউ ডান হাতের কবজিটা জাপটে ধরতেই ভয়ংকরভাবে চমকে উঠল সুমেশ। জ্বরের ঘোরে বেহুঁশ নিহারিণী দেবী কখন যে জেগে উঠেছেন, খেয়াল করেনি সুমেশ। গলার ভেতর থেকে একটু

ঘড়ঘড়ে আওয়াজ বেরিয়ে এল তাঁর—"কিছু বলবে পিসি? কী চাই?"

বুড়ি অপলক শূন্য ঘোলাটে দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকাল। গালগুলো বসে চোয়ালের কাঠামো ভয়ংকরভাবে ফুটে উঠেছে বৃদ্ধার মুখে। মানুষ ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগোলে নিজের যাবতীয় কৃত্রিমতা বুঝি এইভাবেই ত্যাগ করে এগোয়।

এমন সময় ড্রাইভার কিছু একটা বলতেই, সুমেশ শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে উঠল, "কিছু বললে ভাই?"

"হ্যাঁ, বলছিলাম, এটা কোন জঙ্গল? এই রাস্তাটা বেশ অনেকটা গিয়েছে এই জঙ্গল ধরে।"

সুমেশ ড্রাইভারের কথার রেশ ধরে জানালার বাইরের দিকে তাকাল। হ্যাঁ, গাড়িটা সত্যি সত্যি একটা জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলছে। রাস্তা যত সামনের দিকে এগোচ্ছে, দু-দিকের গাছের সারির ঘনত্ব ততই বাড়ছে পাল্লা দিয়ে। সুমেশ নিজেও অবাক, তাদের বাড়ির এত কাছে যে একটা জঙ্গল রয়েছে, সেটা তো সে নিজেও জানত না।

"ভাই, ওই যে বললাম না। আমি তো এই এলাকায় নতুন। আমার ঠিক জানা নেই, বুঝলে?"

ঠিক এমন সময় আবার একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ।

সুমেশ দেখল, বৃদ্ধা বিস্ফারিত নয়নে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। কিছু একটা বলবার চেষ্টায় ছটোপুটি করছেন। গলার ভেতরে কফ ঘড়ঘড় করলে যেমন শব্দ বের হয়, এখানেও ঠিক তেমন শব্দ বের হচ্ছে। সুমেশের অস্বস্তি হতে লাগল বৃদ্ধার এই অবস্থা দেখে। এই তো এতক্ষণ ঠিক ছিল।

"কী হয়েছে, পিসিমা? একটু শান্ত হও। কিছু বলবে?"

এই রে? হসপিটালে পৌঁছোনোর আগে মারা যাবে নাকি... তাহলে তো আরেক ঝামেলা হবে। বৃদ্ধা তার হাত খামচে ধরছে ভয়ংকরভাবে। হয়তো শেষ মুহূর্তে কিছু বলতে চাইছে। সুমেশ দেরি না করে, সেদিন সুমিতা দেবী

যেমন করেছিলেন, ঠিক তেমনি নিজের কানটা তার মুখের কাছে এনে ধরল সুমেশ।

না, সে বুঝতে পারল না, কী বলছেন এই বৃদ্ধা। একই রকম একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ। ঠিক এমন সময় সুমেশের দৃষ্টি একপাশে রাখা জলের বোতলের দিকে পড়তেই চমকে উঠল সে... তাহলে কি বৃদ্ধা জল খেতে চাইছেন? সুমেশ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে, বোতলের মুখটা বৃদ্ধার মুখের কাছে এনে অল্প অল্প জল ঢালতে লাগল। হ্যাঁ, ওই তো বৃদ্ধা, অল্প অল্প করে খাচ্ছে। জল খাওয়াতেই বৃদ্ধা কেমন যেন স্থির হয়ে গেল। সুমেশের কালঘাম যেন ছাড়ল। এখন কোনওমতে দুর্গা দুর্গা করে হাসপাতালটুকু পৌঁছোতে পারলেই... কথাটা ভাবতে ভাবতেই সিটের তলায় ঝুঁকে বোতলটা রাখতে যেতেই, অ্যাম্বুলেন্সের ভেতরের আলোটা দপদপ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে নিজের আগের অবস্থানে ফিরে আসতে গিয়েই যা দেখল, তাতে এক মুহূর্তের জন্য বুকের ভেতরটা খালি হয়ে গেল।

তার মুখের সামনে স্ট্রেচারের ওপর সটান উঠে বসেছেন বৃদ্ধা। একেবারে সুমেশের মুখোমুখি। মাথার ওপর আলোটা ভয়ংকরভাবে দপদপ করছে। বৃদ্ধা আচমকাই দু-হাতে করে সুমেশের ঘাড়টা সজোরে নিজের দিকে টেনে, তার কানের কাছে মুখ এনে, খুব টেনে টেনে, প্রায় সাপের শিসের মতো করে ফিশফিশ করে বলে উঠল তিনটা শব্দ...

"মড়ি... মড়ি... মড়ি..."

আর ঠিক তারপরেই ধপ করে, পিছনদিক বরাবর স্ট্রেচারের ওপর পড়ে গেল তার শরীরটা। একটা ভোঁতা শব্দ হল মাত্র। বিস্ফারিত চোখ গাড়ির ছাদের দিকে নিবদ্ধ। মুখ হাঁ হয়ে যাওয়া। কেউ দেখলে বলবে না, এই মহিলা একটু আগেই উঠে বসেছিলেন। শুধু উঠেই বসেননি, সজোরে নিজের দিকে টেনে কী সব বলে গেলেন।

সুমেশের বুকটা এখনও উত্তেজনায় ওঠানামা করছে। কিছুক্ষণ এইভাবে বসে থাকার পর খানিকটা ধাতস্থ হতে সে ধীরে ধীরে নিজের হাতটা বুড়ির

নাকের কাছে নিয়ে এল। নাহ্! কোনও শ্বাস নেই। তাহলে? মারা গিয়েছে?

কথাটা মনে মনে বলতে যতক্ষণ। আচমকা একটা তীব্র ঝাঁকুনি। আর সেই সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ব্রেক কষার আওয়াজ। আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার ওপর তীব্রভাবে চাকা ঘষটে যাওয়ার শব্দ। এক মুহূর্তের জন্য গাড়ির ভেতরে ছিটকে পড়ল সুমেশ।

"আহ্!"

তখন অল্প চোট লাগলেও, এখন যেন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সুমেশ। মাথার পিছনটা সঙ্গে সঙ্গে ফুলে উঠেছে। চোখে যেন অন্ধকার দেখছিল একটুর জন্য। কোনওক্রমে নিজে সামলে উঠে দেখল, স্ট্রেচারের বাইরে নিহারিণী দেবীর পা ঝুলছে।

"আরে ভাই, কী করছ কী? সাবধানে চালাতে পারছ না?" প্রচণ্ড রাগে চিৎকার করে উঠল সুমেশ। এসব ড্রাইভারকে কারা লাইসেন্স দেয়? মনে মনেই গজগজ করতে করতে নিহারিণী দেবীর পা-খানা আবার স্ট্রেচারের ওপর তুলে দেয় সুমেশ। কিন্তু সামনে থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে আবার চিৎকার করে উঠল সে, "কী হল, ভাই? এই জঙ্গলের মধ্যে গাড়ি থামালে কেন?"

নাহ্, সামনে থেকে কোনও সাড়া এল না।

"কী ভাই, কিছু কথা বলছ না কেন? কী হল? চলো...ও...ও..." নাহ্, এখনই ড্রাইভারকে জানানোর দরকার নেই যে, বুড়ি মারা গিয়েছে। হাসপাতালে যাই। ডাক্তার দেখুক। তারপর না হয় ভাবা যাবে। কিন্তু নাহ্, গাড়ি তো স্টার্ট করছে না সুবিমল। আবার গাড়িটার এমন সিস্টেম যে পিছনদিকে বসলে, ড্রাইভারের কাছে কী হচ্ছে, সেসব জানা যায় না। অগ্যতা আর দেরি না করে সুমেশ পিছনদিকের দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর দরজাটা ভালো করে লাগিয়ে ড্রাইভারের সিটের দিকে এগিয়ে এল, চাপাস্বরে চিৎকার করতে করতে।

"কী ব্যাপার বলো ভাই? কী সমস্যা তোমার... কথা বলছ না কেন? তখন

ধরে জিজ্ঞাসা করছি...।"

ড্রাইভারের জানালার কাছে এসেই থমকে গেল সে। গাড়ির সামনের দিকে কোনও আলো জ্বলছে না। পিছনদিকের আলোর ছিটেফোঁটাও সামনের দিকে আসছে না। হেডলাইটের হলুদ আলো সামনের রাস্তায় পড়ে যেটুকু আভা গাড়ির ভেতরে এসে পড়ছে, সেইটুকু আলোয় দেখা গেল, ড্রাইভার সুবিমল দাস প্রবল বিস্ফারিত চোখে হাঁ হয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। সেই চোখজোড়ায় একই সঙ্গে বিস্ময়, একই সঙ্গে প্রবল আতঙ্ক। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। গলার ভেতর থেকে গোঁ গোঁ করে একটা শব্দ বেরিয়ে আসার চেষ্টা করছে বটে, তবে তা খুব ক্ষীণ।

সুমেশ তার চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করে সামনে তাকাল। অন্ধকার ফাঁকা পিচের রাস্তার দু-দিকে ঘন গাছের সারি। গাছেদের গোড়ায় গোড়ায় চাক বেঁধে জোনাক জ্বলছে। গাড়ির ইঞ্জিনের ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়াও, বনের ভেতর থেকে ঝিঁঝিপোকার ডাক স্পষ্ট শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। সুমেশ দেখল, অ্যাম্বুলেন্সের হেডলাইটের হলুদ আলো, ফাঁকা রাস্তার বুক চিরে সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই আলোয় তো সামনে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তাহলে ড্রাইভার এত ভয় পাচ্ছে কী দেখে?

"ভাই? এ ভাই? কী হয়েছে? এরকম করছ কেন?" নাহ্। কোনও সাড়া নেই। যেন একটা ভয়ংকর ঘোরে চলে গিয়েছে সে। সুমেশ দেরি না করে ড্রাইভারের কাঁধ ধরে একটা জোরে ঝাঁকুনি দিল।

"এই ভাই, কী হয়েছে?" সুমেশের ঝাঁকুনিতে সঙ্গে সঙ্গে যেন সংবিৎ ফিরে এল চালকের। খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে সুমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠল, "রাস্তার মা...মা...মাঝে আমি কাউকে দেখলাম।"

"কাকে দেখেছ?" সুমেশ আবার সামনের দিকে তাকাল—"এখানে তো কেউই নেই?"

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল ড্রাইভার, "আমি সত্যি সত্যি রাস্তার মাঝে কাউকে দেখেছি। এই... এই ঠিক এইখানে।" কথা বলতে বলতেই

সুবিমল দাস খানিকটা এগিয়ে গেল। হেডলাইটের আলো এখন তার শরীরে পড়ছে। তারপর একটা নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়িয়ে বলল, "ঠিক এই, এই এখানে ছিল জিনিসটা। আমি স্পষ্ট দেখেছি।"

সুমেশ বুঝতে পারল, লোকটা এখনও প্রচণ্ড ভয় পেয়ে রয়েছে। কথা জড়িয়ে যাচ্ছে থেকে থেকেই।

"কেউ থাকলে, এরই মধ্যে যাবেটা কোথায়? তুমি নিশ্চয়ই ভুল দেখেছ। এসো, দেরি হচ্ছে।"

সুবিমল দাস পড়ি-মরি করে ছুটে এল তার কাছে। "না দাদা। বিশ্বাস করুন। আমি ভুল দেখিনি একেবারে। আমি স্পষ্ট..."

"কী দেখেছ? মাঝরাস্তায় কেউ দাঁড়িয়ে ছিল?"

"নাহ্।"

"একজন মহিলা ঠিক মাঝরাস্তা বরাবর শূন্যে ভাসছিল!"

"কী!"

"হ্যাঁ, দাদা বিশ্বাস করুন। আমি স্পষ্ট দেখেছি। একটা মেয়ের শরীর ঠিক ওখানে, মাঝরাস্তার ওপরে শূন্যে ভাসছিল... তা-ও আবার কেউ চক্রাসন করলে কোমরের দিক থেকে যেমন বেঁকে যায়-না, ঠিক তেমনভাবে...।"

"তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে নাকি? কী সব ভুলভাল বকছ? নাকি নেশা-টেশা করেছ?" প্রচণ্ড বিরক্তিতে মাথা গরম হয়ে গেল সুমেশের। এই টেনশনের সময়ে জঙ্গলে দাঁড়িয়ে কী সব গল্প শোনাচ্ছে এই ড্রাইভার? নিশ্চয়ই নেশা করবার অভ্যাস আছে। কাকে নাকি শূন্যে ভাসতে দেখেছে। যতসব ভাঁওতাবাজি!

"এই শোনো, তুমি গাড়িতে ওঠো তো... তাড়াতাড়ি হাসপাতালে পৌঁছোতে হবে। অনেক হয়েছে। আর তেমন হলে নইলে আমি তোমার সঙ্গে বস..."

কথাটা শেষ করবার আগেই আচমকা একটি শব্দ শুনে চমকে উঠল সুমেশ। একটা কাঁসরের শব্দ। খুব কাছ থেকেই পাওয়া যাচ্ছে... শব্দ শুনে মনে হচ্ছে,

কেউ খুব অস্থিরতার সঙ্গে একনাগাড়ে কাঁসর বাজিয়ে চলেছে।

সুবিমল দাসও চমকে উঠেছে। এইখানে কাঁসরের শব্দ, এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে, কাঁসরের শব্দ সে নিজেও কল্পনা করেনি।

"এই বনের মধ্যে মন্দির-টন্দির আছে নাকি? এত রাতে এখানে কাঁসর কে..."

সুবিমলের অনাবশ্যক কৌতূহলে বিরক্ত হল সুমেশ।

"থাকতে পারে, কিন্তু সেসব জেনে আমাদের কী? এরকম বনের মধ্যে এমন অনেক পুরোনো মন্দির থাকে। তুমি গাড়িতে..." কথা বলতে বলতেই গাড়ির পিছনদিকে চলে এসেছিল সুমেশ। কিন্তু দরজার কাছে পৌঁছে ও যা দেখল, তাতে ওর মনে হল, কে যেন ওর পা-জোড়া টেনে মাটির মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে।

অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দুটো দরজাই হাট করে খোলা। আর স্ট্রেচারটা খালি। একটু আগেই রেখে-যাওয়া নিহারিণী দেবীর মৃতদেহ সেখানে নেই!

সুমেশের গলা থেকে একটা চাপা আর্তনাদ ছড়িয়ে পড়তেই চমকে উঠল সুবিমল। ভয়ংকর কোনও বিপদের আশঙ্কায় এসে যা দেখল, তাতে মুহূর্তের জন্য সে পাথর হয়ে গেল। অ্যাম্বুলেন্স খালি! পেশেন্ট নেই!

"এ কী? পেশেন্ট গেল কোথায়?"

"জানি না।" সুমেশের মাথা কাজ করছে না। এসব কী হচ্ছে? "একটু আগেও এখানে ছিল। এখন নেই।"

"দরজা খোলা দেখে কোনও জন্তুতে টেনে নিয়ে গেল নাকি...?" সুবিমল নিজে বুঝতে পারছে না আজ এগুলো কী হচ্ছে। ওদিকে তখনও একনাগাড়ে বেজে চলেছে সেই কাঁসরের শব্দ।

"সম্ভব নয়... আমার স্পষ্ট মনে আছে... আমি দরজা ভালো করে লাগিয়েছিলাম..."

"তাহলে... কোথায় যাবে জ্যান্ত পেশেন্ট...?"

অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দুটো দরজাই হাট করে খোলা।
আর স্ট্রেচারটা খালি।

"জানি না। আমি কিছু জানি না। এবার...? এবার কী হবে?" কথাটা শেষ হল না। আচমকা ঝুপ করে গাড়ির হেডলাইটটা অফ হয়ে গেল। শুধু হেডলাইট নয়, অ্যাম্বুলেন্সের পিছনের দিকের জ্বলতে-থাকা দপদপে এলইডি আলোটাও নিবে গিয়ে চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল।

এই অন্ধকার বনের মাঝে একটা রাস্তা, রাস্তার ওপর আলোবিহীন একটা অ্যাম্বুলেন্স, অ্যাম্বুলেন্সে উপস্থিত তিনজনের মধ্যে একজন নিখোঁজ। আর বাকি দুজন এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অ্যাম্বুলেন্সের পাশে দাঁড়িয়ে।

"এসব কী হচ্ছে আজকে আমাদের সঙ্গে?" রাগে-হতাশায় চিৎকার করে উঠল সুমেশ।

"দাঁড়ান, অস্থির হবেন না। উনি এখানেই কোথাও আছেন।" কথাটা বলতে বলতেই সুবিমল গাড়ির সামনের দিকে চলে গেল। ঘুটঘুটে অন্ধকারেই ডিকির মধ্যে হাতড়ে বের করে আনল একটা ছোট্ট টর্চলাইট। টর্চলাইট ছোট হলেও আলোর বেশ তেজ রয়েছে। সুবিমল দেরি না করে চারদিকে টর্চলাইটের আলো নিক্ষেপ করতে লাগল। সুবিমলের উজ্জ্বল টর্চের আলো অন্ধকার বনের বুক চিরে অনেকটা গভীরে ঢুকে যাচ্ছে বটে, কিন্তু কোথাও গিয়ে নিহারিণী দেবীর কোনও চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে না। বাধ্য হয়ে সুবিমল গাছের মাথায় টর্চের আলো মারতে লাগল। কিন্তু না, কোথাও কোনও চিহ্ন নেই। যেন কর্পূরের মতো উবে গিয়েছেন তিনি।

প্রায় মিনিট দশেক হন্যে হয়ে খোঁজাখুঁজির যখন তাকে পাওয়া গেল না, তখন সুবিমল দাসও আশা ছেড়ে দিল।

"না দাদা, মনে হচ্ছে... পাওয়া যাবে না।" হতাশার সুর ঝরে পড়ল সুবিমলের গলা ঠেলে।

এতক্ষণ যেটুকুও আশা ছিল, তা যেন এই কথা শোনার পর হুট করে নিবে গেল সুমেশের কাছে। পিসিমার দেহ না-পাওয়া গেলে যে তার সব প্রাপ্তির অকাল বিসর্জন ঘটবে, সেটা বুঝতে পেরেই প্রবল রাগে আর হতাশায় একটা সজোরে ঘুসি বসাল অ্যাম্বুলেন্সের গায়ে। আর তখনই ঠুক করে কী একটা

ঝুলে পড়ল অ্যাম্বুলেন্সের মাথা থেকে। চমকে উঠেই সুবিমল টর্চলাইটের আলো সেদিকে নিক্ষেপ করতেই শিউরে উঠল দুজনেই। একজোড়া পা। ঝুলছে অ্যাম্বুলেন্সের মাথা থেকে। এক মুহূর্ত দেরি না করে, সুবিমল হাতের আলোটা অ্যাম্বুলেন্সের মাথার ওপরে তাক করতেই যা দেখল, তাতে করে একটা অজানা শীতল আতঙ্কে কেঁপে উঠল দুজনেই।

বুড়ির দেহ অ্যাম্বুলেন্সের মাথায় শোয়ানো। পা-খানা ছাদ থেকে পিছনদিকের জানালার কাচ বরাবর ঝুলছে। ঘাড় ওদের দিকে কাত করা। টর্চের আলো সরাসরি বুড়ির মুখের ওপরে পড়ছে। খোলা চোখ, হাঁ হয়ে-যাওয়া মুখ, শণনুড়ির মতো সাদা খোলা চুল। এক পলক সেইদিকে তাকালেই বুকের ভেতরে আপনা থেকেই হিম হয়ে আসে।

"এখানে কে তুলল পিসির দেহটা?" সুমেশ যেন কথা বলতেই ভুলে গিয়েছে।

"উনি বোধহয় আর বেঁচে নেই।" সুবিমলের কথায় আচমকা ঘোর ভাঙল সুমেশের। ইশ্, ভেবেছিল, ব্যাপারটা লুকিয়ে ফেলতে পারবে। এরপর? এরপর কী হবে?

"এখন কোথায় যাবেন? হাসপাতালে গিয়ে তো আর লাভ হবে না। তাহলে কি বাড়ি ফিরে যাবেন?"

সুমেশ হতাশ গলায় বলল, "না। হাসপাতালই যাব। ওরা দেখে বলুক। তারপর।"

সুবিমল গম্ভীর মুখে বলল, "চটপট হাত লাগান। জায়গাটা ঠিক লাগছে না।" কথাটা বলতে বলতেই ড্রাইভার চারদিকে একবার চোখ বোলাল। আর ঠিক তখনই গাড়ির হেডলাইট আর পিছনের কেবিনের এলইডি আলো একসঙ্গে জ্বলে উঠল। ড্রাইভার একটু বেশিই তাড়াহুড়ো করতে লাগল। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, ও পরপর ঘটনায় ভয় পেয়েছে বেশ। সুমেশ দেরি না করে, সুবিমলের সাহায্যে অ্যাম্বুলেন্সের মাথা থেকে পিসিমার দেহটা নামিয়ে স্ট্রেচারের ওপরে তুলে দিল।

তারপর নিজে উঠে বসল পিছনদিকে। গাড়িতে উঠে বসামাত্রই সুবিমল দাস গাড়ি ছেড়ে দিল সদরের হাসপাতালের উদ্দেশে। সে নিজে এত বছর গাড়ি চালাচ্ছে। অনেক পেশেন্টের মরদেহকে এদিক-ওদিক নিয়ে যেতে হয়েছে নির্জন রাস্তায়। কিন্তু এই অভিজ্ঞতা এই প্রথম। নাহ্, আর যা-ই যাক, সে আর মাঝপথে কোথাও থামবে না। ওদিকে গাড়ির পিছনদিকে বসে বুড়ির হাঁ হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সুমেশ। যেন কীসের একটা উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে চলছে সে। অনেকটা পথ এসে গিয়েছে। কিন্তু তখনও কানে এসে বাজছে সেই কাঁসরের শব্দ। সুমেশ জানে না এই কাঁসরের শব্দ কীসের। কিন্তু আমরা জানি, এই শব্দ এক ভয়ংকর শব্দ। মড়িক্ষণের সূচনা হলে এই শব্দ বেজে ওঠে পশ্চিমের জঙ্গলে। যে ক্ষণে কেউ মারা গেলে সেই মৃতদেহকে বাড়ির বাইরে রাখতে নেই। কিছুতেই রাখতে নেই।

(তৃতীয় খণ্ড)

(১)

মড়িছাপ

"মিথ্যে বলছ তুমি!" ভিড়ের মধ্যে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোক গর্জে উঠলেন সুমেশের দিকে তাকিয়ে। "তুমি মিথ্যা বলছ। সকাল থেকে তুমি মিথ্যা বলে যাচ্ছ।"

ক্লান্ত সুমেশ ভদ্রলোকের দিকে তাকালেন। এঁকে সকাল থেকে দেখছে সুমেশ। শুধু সকাল থেকে না। কালকে রাতেও দেখেছিল। এই মুহূর্তে মল্লিক বাড়ির উঠোন ঘিরে থিকথিক করছে সারা পাড়ার ভিড়। উঠোনের একপাশে একটা মাদুর পেতে তার ওপরে শুইয়ে রাখা হয়েছে নিহারিণী দেবীর মৃতদেহ। ইতোমধ্যেই নতুন শাড়ি পরিয়ে, কপালে চন্দনের ফোঁটা আর বন্ধ চোখের ওপরে তুলসীপাতা দিয়ে তাঁকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু কাল থেকে হাঁ হয়ে-যাওয়া মুখটাকে কিছুতেই বন্ধ করা সম্ভব হয়নি। গলায় পরানো হয়েছে একটা সাদা রজনিগন্ধার মালা। একপাশে একতাল গোবরের ওপর গেঁথে দেওয়া হয়েছে একগোছা ধূপ। সেই ধূপেরই ভুরভুরে গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে পুরো বাড়িতে।

উঠোনটা সিমেন্ট দিয়ে বাঁধাই করা। একপাশে একটা তুলসীমঞ্চ। সকালেও তুলসীমঞ্চের সামনেটা জলে ভেজা ছিল। এখন সেই জল শুকিয়ে গিয়েছে। সম্ভবত মুনিয়ার মা-ই তুলসী গাছে রোজ সকালে জল দেন।

সুমেশ দেখল, উঠোনের একপাশে, টুপাই তার মায়ের কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বীথির মুখ থমথমে। কাল রাতে নিহারিণী দেবীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, ডেথ সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে, কিন্তু কয়েক ঘণ্টা দেরি হবে। সময় নষ্ট না করে, বীথিকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে সুমেশ। পুরোটা জানায় তাকে। এমনকী রাস্তায় যা যা হয়েছিল থেকে শুরু করে জঙ্গলের মধ্যে বেজে-ওঠা কাঁসরের ঘণ্টা সম্পর্কেও।

সবটা শুনে বীথি কিছু কথা বলে, "তুমি যে কাঁসরের শব্দ শুনেছ, ওটা আমিও শুনেছি। এখানে তো কেউ কিছুই বলছে না, তবে আমায় একটু আগেই মুনিয়ার মা অনেক কিছু জানিয়েছে এই সম্পর্কে। যে কাঁসরের শব্দ শুনেছ, ওটা কোনও পুজোর বাজনা নয়। মড়িক্ষণ শুরু হলে আর সেই সময় কেউ মারা গেলে, ওই জঙ্গলের মধ্যে থাকা কারা নাকি ওই কাঁসর বাজিয়ে সকলকে সচেতন করে। সকলকে জানায়, ওই সময় নাকি মড়াকে ঘরের বাইরে বের না করতে। কালকেও সেইজন্যই কাঁসরের শব্দ বেজে উঠেছিল।"

"মানে?" সুমেশের অবাক-হওয়া স্বর ঝরে পড়েছিল ফোনের ওপারে।

"মানে, তুমি না চাইলেও এরা জেনে গিয়েছে যে, বুড়ি রাস্তাতেই মারা গিয়েছে। আর এরা সহজে ব্যাপারটাকে মেনে নেবে না। তুমি বাড়ি ফিরে এলে ঝামেলা হতে পারে।"

"তার মানে আমি বাড়ি ফিরব না? এই মড়া নিয়ে তাহলে কোথায় যাব?"

"আসবে, তবে আজ রাতে নয়। কালকে সকালে। যতটা দেরি করা যায়। আমি আরও কিছু শুনেছি, সেটা আরেকটু অদ্ভুত। মড়িক্ষণে কেউ মারা গেলে এরা সেই মৃতদেহ নাকি দাহ করে না। বদলে সেটা রেখে আসে খোলা ছাদে বা বাড়িরই কোনও নির্জন জায়গায়। এরা বিশ্বাস করে, কেউ এসে নাকি ওই মড়া খায়। এই মড়া নাকি তার ভোগ।"

"কী!"

"হ্যাঁ, মুনিয়ার মা নাম বলতে চাইল না। বুঝলাম, তার নাম মুখে নিতে

এরা বেশ ভয় পায়। তবে আমি যেটুকু বুঝলাম, পুরোটাই একটা প্রচলিত মিথ। আর তাকে জড়িয়ে-থাকা কিছু কুসংস্কার।"

ফোনের ওপার থেকে বীথির কথা শুনতে শুনতেই খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল সুমেশ। সে নিজেও কুসংস্কারে বিশ্বাস করে না। কিন্তু একটু আগেও জঙ্গলের রাস্তায় যার সাক্ষী ছিল সে, সেটাকেই বা কী দিয়ে ব্যাখ্যা করবে?

"...তার মানে তুমি বুঝতেই পারছ। কাল তুমি বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গেই, এখানকার লোকেরা হামলে পড়বে তোমার ওপরে। আমি এখনও কিছু লোককে বাড়ির আশপাশে ঘোরাঘুরি করতে দেখছি। কোনওমতে সেসব যদি কাটানোও যায়, সব থেকে বড় অসুবিধে যেটা হবে, সেটা হল, এরা ওই মড়া সৎকার করতে দেবে না। ওরা ওদের বিশ্বাসের জায়গা থেকেই এই মড়াকে ছাদে রেখে আসবে। আর তারপর একটা বীভৎস পরিণতি হবে এই দেহের। তুমি না পারবে সৎকার করতে। আর না পারবে পারলৌকিক কোনও কাজ শেষ করতে। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমরা কত বড় অসুবিধায় পড়তে চলেছি? এইরকম হলে কিন্তু... এই সম্পত্তি আমাদের হাতে আসতে গেলে আমাদের অনেক ঝামেলায় পড়তে হবে।"

"তাহলে? এখন উপায়?..."

ফোনের ওপারে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল বীথি।

"যা-ই হয়ে যাক, আমাদের এই মড়া দাহ করতেই হবে। তার জন্য হাজারবার একই মিথ্যা বলতে হলে তা-ই বলবে। একবার হিন্দু মতে মৃতদেহ দাহ হয়ে গেলে, আর কারও কিছু করবার থাকবে না। দাহ থেকে শুরু করে পুরো পারলৌকিক কাজটা তুমি ছেলের মতো করে শেষ করলেই এই সম্পত্তি পেতে তোমায় কে আটকাবে?"

"কিন্তু এরা? এরা বাধা দেবে না? আমি বলব, আর এরা মেনে নেবে? দীর্ঘদিনের কুসংস্কার এদের... বীথি। আজকেই দেখলে না, কেমন একটা একগুঁয়ে হয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল সকলে।"

সুমেশের কথা শুনে এক মুহূর্ত কী যেন ভাবল বীথি। তারপর বিড়বিড়

করে বলে উঠল, "সেইজন্য আমাদের অপরেশবাবুকেও সঙ্গে রাখতে হবে, যাতে কোনও গণ্ডগোল হলে, উনি ব্যাপারটা সামলে নেন। কাল সকালে ওখান থেকে বেরোনোর সময় মনে করে একবার অপরেশবাবুকে ফোন করে সবটা জানাতে ভুলো না..."

উঠোনের একপাশে বসে বসে এসবই ভাবছিল সুমেশ। ঠিক সেই সময় এই ভদ্রলোক চিৎকার করে উঠলেন।

কাল সারারাত না ঘুমিয়ে সুমেশের চোখজোড়া টকটকে লাল। সারা মুখ উশকোখুশকো। সুমিতা দেবীকে কাছেপিঠে কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

"আমি সকাল থেকে অনেকবার বলেছি। আবারও বলছি। পিসিমা রাস্তায় মারা যাননি। আমি নিজেও কাঁসরের শব্দ শুনেছিলাম। কিন্তু পিসিমা হাসপাতালেই মারা গিয়েছেন। তাই তো বডি বের করে আনতে এত সমস্যা হয়েছে। আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, কিন্তু এটাই সত্যি।"

"অমুয়াদের সঙ্গে দেখা হওয়ার কোনও প্রভাব নেই বলছ? কৃষ্ণপক্ষে পাগলা যে বাড়িতে আসে, তার পিছুপিছু সেই বাড়িতে সেই ভয়ংকরীও আসে। সেসব মিথ্যা? কাল অনেকদিন পর পশ্চিমের জঙ্গল থেকে ফের কাঁসরের শব্দ ভেসে এল—এসব মিথ্যা বলছ?"

"আচ্ছা।" আচমকা উঠোনের একদিক থেকে একটা জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বর ভেসে এল। "অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের অনেক কথা শুনছি। কাঁসরের শব্দ অনেক কারণেই বাজতে পারে। শুধুমাত্র এই কারণের জন্য ধর্মপরিপন্থী কাজ করা যায় না।"

অপরেশবাবু এতক্ষণ একটাও কথা না বলে সবটা শুনছিলেন। কিন্তু যখন তিনি কথা বলা শুরু করলেন, তখন ভিড়ের অনেক প্রবীণ ব্যক্তিই অবাক হলেন তাঁর কথা শুনে, "ধর্মপরিপন্থী?"

"হ্যাঁ, তা ছাড়া আবার কী? হিন্দুধর্মে নিয়ম রয়েছে, মারা গেলে মৃতদেহের সৎকার করতে। তার পরিবার রাজি, তাঁদের সৎকারে কোনও সমস্যা নেই।

সেখানে একটা প্রচলিত মিথকে আঁকড়ে ধরে একটা সংস্কারকে বাধা দিচ্ছেন আপনারা। শুধু তা-ই নয়, বলছেন এই দেহকে রাতের বেলা খোলা ছাদে ফেলে রাখতে। যাতে করে মড়ি নামের কেউ এসে এই মড়া খায়। বাই দ্য ওয়ে, এই মড়ি কে?"

"হেমতপুরের অভিশাপ। এক ভয়ংকরী। যার ভোগ হল কৃষ্ণপক্ষের মধ্যাহ্নের পর মারা-যাওয়া কোনও মৃতের মড়া। তাকে রাগাতে নেই। সে একবার রেগে গেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে।" কালকের সেই কম চুলওয়ালা লোকটা কথাটা বলে উঠতেই, ফিক করে উঠল অপরেশবাবু। আর তাকে হাসতে দেখেই একটা তাচ্ছিল্যের স্বর বেরিয়ে এল সেই ভদ্রলোকের গলা ঠেলে।

"প্রত্যেকটা জায়গার কিছু না কিছু রহস্য থাকে, অফিসার। আপনারা আজকালকার ছেলেমেয়ে। তায় আবার বাইরে থেকে আসা। আপনাদের এ জিনিসের গুরুত্ব বোঝা কখনোই সম্ভব নয়। আপানদের এটা মজা বলেই মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের কাছে এটা আমাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন। কিছু বাইরের মানুষদের জন্য আমরা আমাদের সর্বনাশ তো হতে দিতে পারি না। তা-ই না?"

ভদ্রলোকের মুখে এই কথাগুলো শুনে অজান্তেই চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল অপরেশ বাবুর। তিনি দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "ওই কাঁসরের শব্দ ছাড়া আর কি কিছু রয়েছে, যা জানাবে যে, উনি মিথ্যা বলছেন? উনি ভুল। আর আপনারা ঠিক। এই বৃদ্ধা যে মড়িক্ষণে মারা গিয়েছেন, তার প্রমাণ?"

"ওঁর শরীরে একটা ছাপ থাকবে। সেটাকে মড়িছাপ বলে। খুঁজলে... নিশ্চয়ই এরকম ছাপ...।"

"আপনাদের মধ্যে থেকে কোনও মহিলা এখানে থেকে থাকলে একটু এগিয়ে আসুন।" অপরেশবাবু সম্মিলিত জনতার দিকে তাকিয়ে কথাটা বলে উঠতেই, ভিড়ের মধ্যে থেকে সুমিতা দেবী আর সেই শিউলি নামের বিধবা মহিলাটি এগিয়ে এলেন।

"আপনারা ওঁর দেহটা একটু থরোলি সার্চ করুন তো।" তাঁর নির্দেশ পেয়েই ওঁরা দুজনে ঝটপট করে নিহারিণী দেবীর মড়ার দিকে এগিয়ে গেলেন।

"আপনাদের কথামতো, এই দেহ মড়িক্ষণে রয়েছে, অর্থাৎ এর দেহে নির্ঘাত, ওই কী একটা ছাপ বললেন, ওহ্! মড়িছাপ দেখতে পাওয়া যাবে। যদি পাওয়া যায়, আমি কথা দিচ্ছি, এই দেহ আমরা আপনাদের হাতে তুলে দেব..."

"এ আপনি কী বলছেন অপরেশবাবু?" সুমেশ অবাক হয়ে তাকাল পুলিশ অফিসারের দিকে।

"আমি একদম ঠিক কথা বলছি, সুমেশবাবু। যেই এলাকায় এসে উঠলেন, সেখানকার বিশ্বাসকে আঘাত করতে নেই। আফটার অল, আপনাকেও তো এখানেই থাকতে হবে। সারাজীবন বহিরাগত তকমাটা বয়ে বেড়াতে ভালো লাগবে আপনার?"

কথাটা শেষ করেই তিনি ঘুরলেন ভিড়ের দিকে।

"আর যদি এই বডিতে কোনও রকমের ছাপ খুঁজে না পাওয়া যায় তাহলে... আপনারা এই বডি সৎকার করবেন। তা-ও সমস্ত নিয়ম মেনে... কী রাজি তো?"

"সে কিন্তু একবার এরকম ভেলকি দেখিয়েছিল। ছাপ না থাকলেও কিন্তু..." একজন বয়স্ক ভদ্রলোক মিনমিন করে এই ধরনের কিছু একটা বলতে গেলেন। কিন্তু আচমকা তাঁর কণ্ঠস্বর চাপা পড়ে গেল সামনে দাঁড়ানো কিছু উত্তেজিত যুবকের চিৎকারে, "রাজি... রাজি... রাজি..." সেই চিৎকারে, যতটা না রাজি হওয়া ছিল, তার চেয়ে অনেক বেশি ছিল পুলিশের সামনে নিজেদের ঔদ্ধত্য দেখানোর প্রচেষ্টা।

কিন্তু আচমকাই উত্তেজিত জনতার চিৎকার কোথায় যেন মিলিয়ে গেল, যখন শিউলির গলা পাওয়া গেল পিছন থেকে, "স্যার, ওঁর গায়ে কোনও ছাপ নেই।"

"কী বলছেন? ছাপ নেই?"

"নাহ্, স্যার। কোনও ছাপ নেই।"

"আপনিও ওঁর দেহে কোনও ছাপ খুঁজে পাননি?" শেষের প্রশ্ন ছিল সুমিতা দেবীর উদ্দেশে। তিনিও কাঁচুমাচু মুখে মাথা নাড়ালেন। নাহ্।

"তাহলে তো মিটেই গেল।" কথাটা বলেই তিনি ফিরলেন সুমেশের দিকে— "সুমেশবাবু, তৈরি হয়ে নিন। পিসিমার দেহ সৎকার হবে।"

ভিড়ের মধ্যে থেকে সেই কম চুলওয়ালা লোক এগিয়ে এল অপরেশবাবুর দিকে—"স্যার, কিছু ভুল হচ্ছে আপনার। মড়িছাপ সব সময় দেখতে পাওয়া যাবে না। সেই কুহকিনীর অনেক ক্ষমতা। অনেক বছর আগে সে এরকমভাবেই একজনের দেহ থেকে মড়িছাপ সরিয়ে ফেলেছিল। সেবারে সে শুধু মড়িছাপই সরায়নি। সে তার মায়ায় এমন কিছু করেছিল, যাতে অনেকক্ষণ পরেও পশ্চিমের জঙ্গল থেকে কোনও সংকেত শব্দ পাওয়া যায়নি। স্যার, আমার মন বলছে, এ দেহ সৎকার হলে, ভয়ংকর সর্বনাশ হয়ে যাবে।"

অপরেশবাবু লোকটির মুখের দিকে তাকালেন—"একটা কথা বলুন তো, আপনারা বলছেন, মড়িক্ষণে কেউ মারা গেলে তার সৎকার করতে নেই। সে নাকি মড়ি নামক এক ভয়ংকরী পিশাচিনীর ভোগ। যে খাবার না পেলে নাকি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আপনাদের সর্বনাশ করবে। আবার আপনাদেরই কথামতো সেই মড়িই কী করছে? মায়া বিস্তার করে সংকেত শব্দ বাজাতে দিচ্ছে না, আবার দেহ থেকে মড়িছাপও তুলে দিচ্ছে, যাতে করে লোকেরা কনফিউজ হয়ে দেহ সৎকার করে ফ্যালে। অর্থাৎ, মড়ি মৃতদেহ নিজেই সৎকার করতে চায়, আবার সেই মড়িই ওই মৃতদেহ না পেলে, আপনাদেরই সর্বনাশ করবে। দুটো ব্যাপারই কেমন বিপরীতমুখী না?"

অপরেশবাবুর যুক্তিতে উপস্থিত সকলেই কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। এমনকি সামনে দাঁড়ানো সেই ভদ্রলোকও। সুমেশ দেখল ভদ্রলোকের কপালে গভীর ভাঁজ। হয়তো তিনিও বাকিদের মতো অপরেশবাবুর যুক্তি মনে মনে যাচাই করে দেখছেন।

"আমি বাইরে থেকে এসেছি মানেই, আপনাদের ইমোশন, অনুভূতিগুলো বুঝব না এমন কিন্তু নয়। আমিও তো মানুষ। আপনাদের মতো আমিও এই সমাজেরই অংশ। আমারও সংসার আছে। কোনও বিপদ এলে আপনাদের মতো আমিও ভয় পাই। কিন্তু যেটা ভুল, সেটা তো ভুল, তা-ই না? দীর্ঘদিন ধরে চলে-আসা একটা কল্পকাহিনিকে বিশ্বাস করে আপনারা অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। দয়া করে আর নয়। আর কোনও গুজবে কান না দিয়ে নিজেরা ভালোভাবে বাঁচুন। বাকিদের ভালোভাবে বাঁচতে দিন। আপনারা দ্রুত সৎকারের ব্যবস্থা করুন। এমনিতেই অনেকটা দেরি হয়ে গিয়েছে।"

কথাটা বলেই তিনি ফিরলেন বীথির দিকে—"বউদি, আর ভয়ের কিছু নেই। এঁরা আপনাদের হেল্প করবেন। একটু সমস্যা ছিল, সেটা মিটে গিয়েছে। এরপর যা যা করণীয়, সেগুলোকে..."

"এখন আপনি আছেন, তাই হয়তো কিছু বলছে না। কিন্তু আপনি চলে গেলে...?"

বীথির কথা শুনে ঠোঁট কামড়ে কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন অপরেশবাবু। "বেশ, আমি তাহলে দুজন কনস্টেবল পাঠিয়ে দিচ্ছি। ওরা থাকলে আশা করি, কোনও ঝামেলা হবে না।"

কথাটা বলে তিনি যেই বেরোতে যাচ্ছেন, ঠিক তখনই সেই কম চুলওয়ালা ভদ্রলোক আবার এসে অপরেশবাবুর সামনে দাঁড়ালেন—"স্যার, আরেকবার ব্যাপারটা ভেবে দেখলে হত না? এইভাবে... যদি কিছু হয়ে যায়, তাহলে কিন্তু ভয়ংকর কিছু হয়ে যাবে, স্যার।"

"আপনার নাম কী?" অপরেশবাবুর স্বর শীতল।

"আজ্ঞে, সনাতন। সনাতন বাউড়ি।"

"সনাতন বাবু। বাড়ি যান। বিশ্রাম নিন। এই বয়সে এত চাপ মাথায় নেবেন না। বিপি বাড়লে সমস্যা আছে।" কথাটা বলেই গটগট করে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন অপরেশ বাবু। আর তার যাওয়ার দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল সনাতন বাউড়ি। সেই সনাতন বাউড়ি, যে একদিন ঠিক

এরকমই একটা জেদ করে, রামকৃষ্ণ সরকারের মৃতদেহকে সৎকারের জন্য এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আজ আরেকজন ঠিক এই একই জেদ করছে। জেদ একই আছে। বদলে গিয়েছে শুধু চরিত্ররা।

(২)

জ্যান্ত মড়া

ভাঙা বাড়িটা ঠিক বনের মাঝবরাবর। একসময় এটা নাকি রাধাকৃষ্ণ জিউয়ের প্রতিষ্ঠিত মন্দির ছিল। নিত্য দেবতার সেবা হত। বর্তমানে মন্দিরের কিছুই অবশিষ্ট নেই। রয়ে গিয়েছে বিশাল চত্বর জুড়ে পড়ে-থাকা ইট-সুরকির কাঠামো। ঠিক যেন এক বিশালাকার দৈত্যের হাড়কঙ্কাল। সেই কঙ্কালের খাঁজে খাঁজেও থাবা বসিয়েছে প্রকৃতি। কালে কালে এটুকুও সে গ্রাস করে নেবে।

এরই মধ্যে মন্দিরের ডানদিকে সার দিয়ে তিন-চারটে ঘর, একে অপরের গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বলা হয়, যখন মন্দিরে ভোগ রান্না হত, তখন নাকি এখানে ভোগের সামগ্রী সব রাখা হত। আজ এখানে এসব জীর্ণ, ভগ্নপ্রায়। কিন্তু ঘরগুলোর সামনেটা দেখলে বোঝা যায়, এখানে মানুষের নিত্য যাতায়াত। চারদিকে গুল্ম, আগাছার ভিড়ে এই একফালি জায়গাটুকুই গোবর দিয়ে নিকোনো। অন্ধকার নেমেছে অনেকক্ষণ। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, কিন্তু তারপরেও অন্ধকারে প্রকৃতির একটা নিজস্ব আলো আছে।

সেই আলো-আঁধারি মাখা বনের ছায়ায়, আচমকা একটি মশালের বিসদৃশ আলো যেন এই মায়াময় দৃশ্যের তাল ভঙ্গ করল। কেউ একজন মশালের আলো হাতে ক্রমাগত এই ভাঙা মন্দির চত্বর পরিক্রমণ করে চলেছে। তার হাঁটার গতি ধীর নয়। বরং এক পলক দেখলে মনে হবে, মশালধারক ধীরলয়ে ছুটছে। বয়স আন্দাজে ষাট-পঁয়ষট্টি। পরনে কালো কাপড়ের খাটো ধুতি।

মাথায় কাঁচাপাকা চুলের জটাজূট। হাত-পায়ের নখ অপরিষ্কার। লোকটি পাক খাচ্ছে। একবার, দুবার, তিনবার, বারবার। আর প্রত্যেকবার ছোটার সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে বিড়বিড় করে বলা কিছু নির্দিষ্ট শব্দ, যেগুলোর সব ক-টা চেনা না হলেও 'মড়ি' শব্দটা আমাদের ভীষণ চেনা।

ঠিক এইরকমই একটি পরিস্থিতিতে ভগ্ন বাড়ির সামনের দরজায়, হ্যারিকেন হাতে আরেকটি পুরুষদেহ এসে দাঁড়াল। এই লোকটিকে এর আগে আমরা দেখেছি। সুমেশ আর বীথি রণপা ধারণ-করা যে লোকটির মুখোমুখি হয়েছিল গতকাল, এ সেই। বয়স্ক লোকটিকে এইভাবে বাড়ির চারপাশে পাক খেতে দেখে, লোকটি দরজার চৌকাঠে হ্যারিকেন রেখেই ছুটে এল। তারপর সেই বয়স্ক লোকটির পথ আটকে তার হাত ধরে গোঙিয়ে উঠল অদ্ভুতভাবে, "আ...আ...আআআ...আআ...।"

গোঙানি শুনেই বোঝা গেল লোকটি কথা বলতে অক্ষম। এই বোবা লোকটিকে বয়স্ক লোকটি কোনওরকমে এড়িয়ে যেতে চাইল। কিন্তু বোবা লোকটি তার হাত শক্ত করে চেপে ধরেছে। শুধু চেপেই ধরেনি। বোবা লোকটির হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে, সে যেন চায় না এই লোকটি এইভাবে, এই ভাঙা বাড়ি ঘিরে পাক খাক।

"হাত ছাড়! হাত ছাড় বলছি... হাত ছাড়..."

"আআ... আআআআ... আ... আআ...।"

"কী? কী চাই তোর...?"

"অঅঅ...।"

"না রে... না। আমি চুপ করে বসতে পারছি না। আমার কেন বারবার মনে হচ্ছে, আজ আবার ভয়ংকর কিছু একটা ঘটতে চলেছে। সেই সেদিনের মতো... যেদিন তোর..."

"আ...আ...আআআ...আ..."

"না রে... মড়িক্ষণের মড়া...। গণনা মিছে নয়। আমার গুরু স্বয়ং বুড়োবাবা।

সে আমাদের সকলকে বাঁচাতে গিয়ে আউধুনির ডাঙায় প্রাণ দিয়েছে। সে বলি মিথ্যা নয়। সেদিনও সেই ভয়ংকরী এক চাল চেলেছিল। আজকেও নিশ্চয়ই আরেক চাল চেলেছে। নইলে মড়িক্ষণের মড়া এঁটো হল না কেন?”

“আআ...আআআ...।”

“ওরে, এতদিনেও জানলি না? সেই সব্বনাশি মুক্তি চায়। দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি চায়। তাকে তো দেহের বন্ধন থেকেই বেঁধে রাখা হয়েছিল। একবার দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পেলে, তাকে কেউ আটকাতে পারবে? কে? কেউ না। সব্বাইকে ছিঁড়ে, ছিবড়ে করে খাবে সে...”

ঠিক এমন সময়ই ওদের ডানদিক থেকে ধক করে একটা শব্দ হতেই ওরা দুজনেই চমকে উঠল। ভাঙা মন্দির প্রাঙ্গণের ডানদিকে একটু ফাঁকামতো জায়গায় কতকগুলো বাঁশের মাথায় লাল কাপড়ের কতকগুলো টুকরো বাঁধা ছিল। এমন বাঁশের মাথায় বাঁধা লাল কাপড়ের টুকরো এর আগে আমরা দেখেছি এই এলাকার প্রত্যেকটা বাড়ির ঈশানকোণে। ধক করে শব্দ হতেই দেখা গেল, বাঁশের মাথায় বাঁধা লাল কাপড়ের টুকরোগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে।

ভয়ে, আতঙ্কে বৃদ্ধ লোকটির চোখজোড়া ঠিকরে যেন বেরিয়ে আসতে চাইল। এ কী দেখছে সে? কী দেখছে? ঝান্ডায় আগুন লাগার মানে তো...

“ওরে বিলু... সব্বনাশ হয়ে গেল রে। সব্বনাশ হয়ে গেল।” মশালটা দূরে ছুড়ে ফেলে, মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে কপাল চাপড়াতে লাগল সেই বয়স্ক লোকটি। ঠিক যেন সন্তান হারানোর ঠিক আগের মুহূর্তে কোনও বেদনায় আর্তনাদ করে-ওঠা মা।

“অ...অ...অঅঅ...”

“কী হয়েছে? কী হয়েছে, জানতে চাস?” বয়স্ক লোকটি যেন গলাকাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে, “ওরে, ওরা মড়ির মড়া জ্বালিয়ে দিচ্ছে রে। সৎকার করে দিচ্ছে রে... সৎকার করে দিচ্ছে। এত কিছু জানার পরেও ওরা সৎকার করে দিচ্ছে। ওরে... ওরে ও বিলু। কী সব্বনাশ হল রে...! ওরে,

কেউ আটকাতে পারবে না রে ওদের সব্বনাশ। কেউ না...”

* * * * * * * * * *

“হরিনাম বলে আমার গৌর নাচে...
হরিনাম বলে আমার গৌর নাচে...
গৌর নাচে, গৌর নাচে গৌর নাচে
গৌর নাচে, গৌর নাচে।”

কীর্তনদলের বোল একটানা বেজেই চলেছে। পাঁচিল দিয়ে ঘেরা এই শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লির ব্যবস্থা নেই। এখনও এখানে কাঠ দিয়েই চিতা সাজানো হয়। এলাকার ডোমের তত্ত্বাবধানে পুরো ব্যাপারটা সমাধা হবে।

ইতিমধ্যেই চিতা সাজানো হয়ে গিয়েছে। চিতাতে নিহারিণী দেবীকে তোলাও হয়েছে। শ্মশানটা আগে নাকি হেমতপুরের মধ্যেই ছিল। তখন নাকি কেবল হেমতপুর গাঁয়ের লোকদেরই এই শ্মশানের ওপর অধিকার ছিল। বাইরের গাঁয়ের লোক নাকি এই শ্মশান ব্যবহার করতে পারত না। পরে সরকারি তহবিল থেকে যখন শ্মশান সংস্কারের টাকা পাঠানো হয়, ঠিক তখনই পুরোনো শ্মশানের জায়গা ছেড়ে দিয়ে একটি নতুন জায়গায় নতুন করে শ্মশান বানানো হয় যেখানে শ্মশানটিকে শুধুমাত্র হেমতপুরের জন্য না রেখে, সার্বজনীন করে দেওয়া হয়। এখন পুরোনো শ্মশানের জায়গায় একটা শ্মশানকালীর মন্দির গড়ে তুলেছে পার্শ্ববর্তী ক্লাবের ছেলেরা। সেই মন্দিরে নিত্যদিন মায়ের সেবা হলেও, শনি-মঙ্গলবার একটু বেশিই ভক্তদের ভিড় বাড়ে।

সুমেশ ডানদিকে তাকিয়ে দেখল, শ্মশানে ঢোকার গেটটিকে ভেতর থেকে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে কোনও গণ্ডগোলের আশঙ্কায়। গেটের বাইরে যে ভিড় খুব একটা রয়েছে তা কিন্তু নয়। ভেতরে যে একদমই লোকজন নেই, সেটাও

আবার নয়। এলাকার জনা পাঁচেক মুরুব্বি গোছের লোক সুমেশের কাছাকাছিই দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁদের থেকে কিছুটা তফাতেই দুজন কনস্টেবল দাঁড়িয়ে থেকে বিড়ি টানছেন নিশ্চিন্তে। শ্মশানে রাতের বেলা মহিলাদের আসা নিষেধ, তাই বীথি আসেনি। তা ছাড়া আচমকাই, সন্ধ্যা থেকে টুপাইয়ের গা-খানা গরম গরম লাগছিল। সুমেশ মনে মনে ভাবল, এখানের কাজটা মানে মানে মিটলে, সে কিছুটা হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। কালকের পর থেকে একে একে যা হয়ে চলেছে। যেন পুরো সিনেমা।

"ও দাদা, এইদিকে আসুন।" ডোম একটা বাঁশের মাথায় একটা খড়ের আঁটিকে ভালো করে বেঁধে, সুমেশকে কাছে ডাকল।

"এতে আগুন ধরালে, সবার প্রথমে মড়ার মুখে একবার ছোঁয়াবেন। তারপর তিনবার চিতাটাকে তাড়াতাড়ি ঘুরে, আগুনটা দিয়ে দেবেন এখানে। মাথায় থাকবে?"

সুমেশ মাথা নাড়াল। ডোমটি চিতার যে অংশে আগুন লাগানোর নির্দেশ দিল, সুমেশ দেখল, সেই জায়গা থেকে বুড়ির পা কিছুটা বাইরে বেরিয়ে রয়েছে। আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মাঝের দৃশটা মনে পড়তেই চমকে উঠল সুমেশ। গাড়ির মাথার ওপর থেকে এইভাবেই পা দুটো একপাশে বাইরে বেরিয়ে ঝুলছিল না? দৃশ্যটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা অজানা অস্বস্তি ঘিরে ধরল তাকে।

পা দুখানার অবস্থান দেখে বোঝা যায়, বুড়িকে মাটির দিকে মুখ করে, চিতার ওপরে শোয়ানো হয়েছে। পিঠের ওপরে চাপানো হয়েছে ভারী কিছু কাঠ।

"নিন দাদা..." ডোমের নির্দেশে সুমেশ খড়-বাঁধা বাঁশটা বাড়িয়ে দিতেই ডোম তাতে আগুন ধরিয়ে দিল। "একবার মুখে ছুঁয়েই, তিনবার পাক খাবেন। তাড়াতাড়ি করবেন... বলো হরি... হরিবোল... বলো হরি... হরিবোল..."

সুমেশের কানে আর কোনও কথা যাচ্ছে না। না হরিধ্বনি, না কীর্তনের বোল, না ডোমের চিৎকার করে কথা বলা... কিছুই যাচ্ছে না। সুমেশ, পিসিমার মুখটা আন্দাজ করে একবার আগুনটা ছুঁয়ে, অতি দ্রুত তিন পাক

চক্কর মারল চিতাটার। আর তারপরেই, ডোমের ইঙ্গিত করার জায়গায় জ্বলন্ত খড়সুদ্ধু বাঁশটাকে ফেলে দিতেই চিতাটা ধরে গেল দাউদাউ করে।

"সরে যান দাদা। আপনি সরে যান। আমরা দেখছি।" ডোমের নির্দেশে সব কাজ হয়ে যেতে, একটু তফাতে সরে এল সুমেশ। চোখ-মুখ ক্লান্ত। কাল রাত্রি থেকে একটানা ধকল চলছে শরীরের ওপরে। এবার একটু বিশ্রাম দরকার শরীরের। কিন্তু মনে কোথাও গিয়ে একটা প্রশান্তি। সে পেরেছে... যেমন করেই হোক এই দেহ সে সৎকার করতে পেরেছে। তা-ও সমস্ত নিয়ম মেনে। এরপর বাকিটাও নিশ্চয়ই ভালোই হবে।

ওদিকে ততক্ষণে চিতা দাউদাউ করে জ্বলতে শুরু করে দিয়েছে। শ্মশানের একপাশে একটা উঁচু স্তম্ভের ওপর পাঁচখানা জোরালো সরকারি এলইডি বাতি। সেই আলোয় দেখা যাচ্ছে, চিতা থেকে বেরিয়ে কুণ্ডলীকৃত ধোঁয়া ধীরে ধীরে আকাশে মিশে যাচ্ছে। একটা কাঠ-পোড়া গন্ধ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। সুমেশ দেখল, কনস্টেবল দুজন গুটিগুটি পায়ে তার কাছে এগিয়ে এল—"ইয়ে... বলছি কী, আমরা তাহলে বেরোই, বুঝলেন। আগুন তো লেগেই গিয়েছে। এরপর পুড়তে যতটুকু। আর কোনও ঝামেলা হওয়ার সম্ভবানা নেই।"

সুমেশ ঘাড় নেড়ে তাদের সম্মতি জানাল। সত্যিই, আর তো গণ্ডগোল হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আর বেশি কিছু হলে সে সামলে নেবে ঠিক। সে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, কনস্টেবল দুটো শ্মশানের গেটটা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল। ওদের বাইক শ্মশানের বাইরে দাঁড় করানো। ওরা ওতে করেই ফিরবে।

সুমেশ এতদূরে দাঁড়িয়েও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সেই জায়গাটা, যেখানে চিতার ভেতর থেকে পা দুখানা বেরিয়ে ছিল। সেইদিকে তাকিয়েই তার মনে নানানরকম ভাবনা বুদ্‌বুদ কাটছিল। এরপর কী করতে হবে? শ্রাদ্ধের খরচের জন্য বৃদ্ধার জমানো টাকাগুলো সে কীভাবে সংগ্রহ করবে? সৎকার বা কালকের আর আজকের গাড়ির খরচ সে মোটামুটি নির্বাহ করে ফেলেছে তার নিজের থেকে। কিন্তু এরপর? এরপর তো নিহারিণী দেবীর টাকায় না

হাত দিয়ে উপায় নেই।

ঠিক এমন সময় একটা জিনিস চোখে পড়তেই আপনা-আপনিই মেরুদণ্ডটা সোজা হয়ে গেল তার। কী দেখল এক্ষুনি সে? সে মনে মনে একাধিক ভাবনা ভাবলেও, তার চোখ ছিল সামনের দিকে নিবদ্ধ। সে যেন স্পষ্ট দেখল। চিতা থেকে বেরিয়ে-থাকা নিহারিণী দেবীর দুটো পা যেন নড়ে উঠল।

চমকে উঠে, নিজের দুটো চোখ ভালো করে কচলে নিল সুমেশ। তারপর ধীরে ধীরে সামনে এগিয়ে গেল।

নাহ্, এখন নড়ছে না তো... তাহলে? সে কি ভুল দেখল? হ্যালুসিনেট করল? কয়েক মুহূর্ত নিজের মনে মনেই এসব ভাবল সুমেশ। হতেই পারে। যবে থেকে এসেছে, ঘটনার পর ঘটনা তো কম ঘটছে, তারপর কাল থেকে ঘুম নেই। ভ্রম দেখাই স্বাভাবিক।

কাঠগুলো হলুদ লেলিহান শিখার আয়ত্তে দাউদাউ করে চলছে। গনগনে লাল ব্যাপারটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সুমেশ। মাঝে মাঝেই ফুটফাট শব্দ বেরিয়ে আসছে চিতার ভেতর থেকে, সম্ভবত শরীরের গাঁটগুলো ফাটছে। আগুনের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই, নিজের মনে মনেই হেসে উঠল সুমেশ।

এই প্রচণ্ড লেলিহান শিখায় কেউ কীভাবে জীবিত থাকবে?

"নেবাও... চিতা নেবাও... আগুনটা নেবাও..." আচমকা একটা ভয়ংকর কর্কশ চিৎকার, পিছনদিক থেকে ধেয়ে আসতেই চমকে উঠল সুমেশসহ বাকি সকলে। দুটো দেহ ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে আসছে ওদের দিকে। অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না ওরা কারা, কিন্তু পিছনের জনের হাতের জ্বলতে-থাকা মশালের আলো যে সামনের জনকে ধরার চেষ্টা করছে, সেটা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে।

সকলেই চোখ সরু করে বোঝার চেষ্টা করছে, কারা এইভাবে আসছে...

"নিবিয়ে দাও ওই চিতা... নিবিয়ে দাও... হায় হায় ! এ কী সব্বনাশ করলে তোমরা! এ কী সব্বনাশ করলে তোমরা..."

চিৎকারের তেজ ক্রমেই বাড়ছে। কিন্তু সুমেশের মনে হচ্ছে এ কোনও চিৎকার নয়। এ যেন এক বুকচেরা আর্তনাদ। চিৎকার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে দেখতেই দুটো দেহ আলোর বৃত্তের নাগালে চলে আসতেই, উপস্থিত বাকিরা প্রচণ্ড ভয়ে আঁতকে উঠল... কিছুজনের মুখ থেকে তো বেরিয়ে এল এক প্রচণ্ড আর্তনাদ...।

"অমুয়া...! অ মু য়া...!" সুমেশ ছাড়া পলকেই প্রত্যেকের মুখ যেন ভয়ে পাণ্ডুবর্ণ হয়ে গেল। উপস্থিত সকলে যেন কোথায় গিয়ে লুকোবে তা খোঁজার জন্য মরিয়া হয়ে এদিক-ওদিক ছুটতে লাগল। কিন্তু সুমেশের ভাবনা অন্যত্র...

সামনের যে লোক, সে বয়স্ক। কিন্তু সে প্রচণ্ড বেগে পাগলের মতো ছুটে আসছে জ্বলতে-থাকা চিতার দিকে। না আটকালে তো সর্বনাশ। এ তো জ্বলন্ত চিতায় গিয়ে পড়বে। জ্বলে ছাই হয়ে যাবে সে মুহূর্তেই... লোকটি সুমেশের হাতের নাগালে আসামাত্র, সুমেশ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরল লোকটিকে। প্রচণ্ড একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। লোকটি কাটা ছাগলের মতো ছটকাচ্ছে, আর চিৎকার করছে, "নেবাও... নেবাও... চিতা নেবাও... নেবাও বলছি..."

"কী করছেন? শান্ত হন। শান্ত হন। পুড়ে মরে যাবেন তো..."

সুমেশ চিৎকার করে উঠল, লোকটি যেভাবে ছটকাচ্ছে, যে-কোনও মুহূর্তে নাগালের বাইরে বেরিয়ে যাবে... সুমেশের সাধ্যে কুলোচ্ছে না ওকে আটকানোর।

পিছনের লোকটিকে গতকালই দেখেছে সে আর বীথি। মশাল হাতে সুমেশের পিছনে দাঁড়িয়ে গোঁ গোঁ করেই চলেছে। বোধহয় বোবা...

"আরে... একে ধরো।" উপস্থিত বাকিদের উদ্দেশে কথাটা বলতে যেই মুখ তুলেছে...

আচমকা মাথার ওপর সাদা আলোটা দপদপ করে উঠল। সুমেশ ঘাড় তুলে দেখল, পাঁচখানা বাতিই একসঙ্গে ভয়ংকরভাবে জ্বলছে-নিবছে। এ কী? এরকমভাবে আলোগুলো জ্বলছে-নিবছে কেন? ওর সঙ্গে সঙ্গে বাকি সকলেও
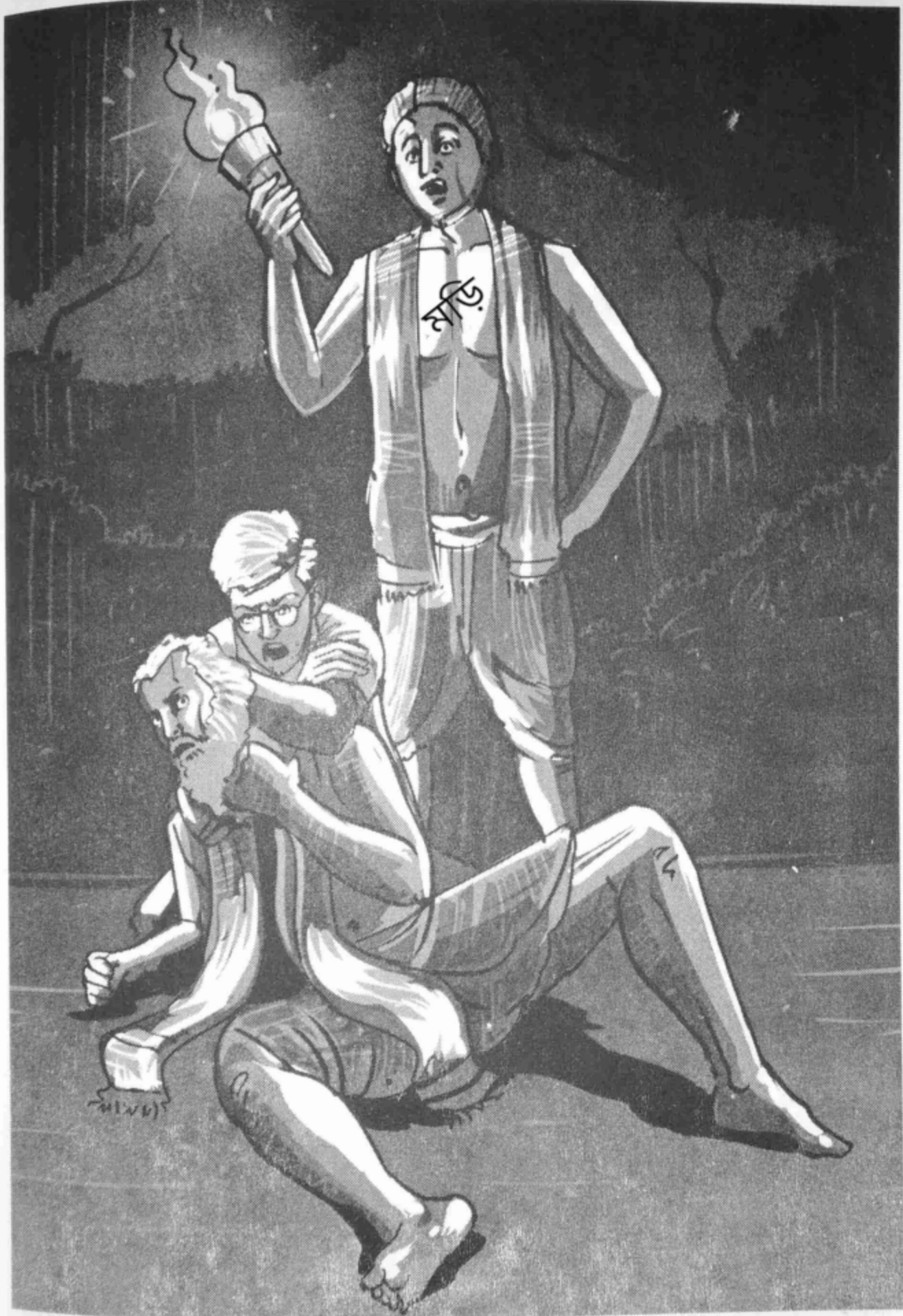
সুমেশ আর এক মুহূর্ত দেরি না করে দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরল লোকটিকে।

অবাক। একসঙ্গে পাঁচখানা বাতি...

আর ঠিক তখনই সুমেশের কপালের ওপর টুপ করে একফোঁটা কী যেন পড়ল। চমকে উঠে কপালে আঙুল বুলিয়ে হালকা চটচটে জিনিসটা যেই চোখের সামনে মেলে ধরল, সঙ্গে সঙ্গে পেটের ভেতরটা এক মুহূর্তের জন্য যেন ফাঁকা হয়ে গেল। রক্ত?

হ্যাঁ, কপালে টুপ করে যেটা ঝরে পড়ল, সেটা আর অন্য কিছু ছিল না, সেটা ছিল রক্ত...

আচমকা এক মুহূর্তে শান্ত হয়ে গেল বয়স্ক লোকটি। যাকে কিছুক্ষণ আগেও জাপটে ধরে রাখা যাচ্ছিল না, সে এখন পুরোপুরি স্থির। ঠিক যেন দেহে প্রাণ নেই। সুমেশ দেখল, লোকটি সরাসরি তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে। তারপর লোকটি সুমেশের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে উঠল, তারপর খুব টেনে প্রায় সাপের শিসের মতো হিসহিসে স্বরে বলে উঠল, "আসছে...। সে আসছে...। খিক খিক খিক খিক খিক...।"

আর ঠিক তখনই শুরু হল প্রচণ্ড বৃষ্টি। কিন্তু এ কী? এ কেমন বৃষ্টি? এ তো বৃষ্টি নয়। দপদপে জ্বলতে-থাকা সাদা আলোয় দেখা যাচ্ছে, এ বৃষ্টি কোনও সাধারণ বৃষ্টি নয়... এ বৃষ্টি... রক্তবৃষ্টি! চমকে উঠে, আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখতেই বুকের ভেতরটা শুকিয়ে গেল, সুমেশের... কখন যে কালো আকাশটা বদলে গিয়েছে কমলা রঙে, সে বুঝতে পারেনি। মুশলধারে বৃষ্টির মতো ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ছে তাঁদের মাথায়, চোখে, নাকে, মুখে, সারা শরীরে।

ওদিকে শ্মশানে উপস্থিত সকলে ভয়ংকর আর্তনাদ জুড়েছে সারা শ্মশান জুড়ে। সারা শ্মশান রক্তবৃষ্টির ছাটে লাল হয়ে গিয়েছে মুহূর্তেই। কাউকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু শোনা যাচ্ছে লোকেদের আর্তনাদ। আর ঠিক সাদা আলোটা নিবে ঝুপ করে অন্ধকার নামল জায়গাটা জুড়ে। আর অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গে চোখের পলকে বৃষ্টিটাও কেমন যেন থেমে গেল। না, একফোঁটা বৃষ্টি নেই। একফোঁটাও না।

চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। আলো বলতে জ্বলতে-থাকা চিতার আলো। কিন্তু এ কেমন জ্বলতে-থাকা চিতা? কোথাও আগুনের লেলিহান হলুদ শিখা নেই। অথচ চিতার কাঠগুলো কেমন গনগনে লাল রঙের হয়ে জ্বলছে। আর সেখান থেকে ভেসে আসছে কাঠ-পোড়া চড়চড় শব্দ। দেখলে মনে হবে, কেউ কোনও রাবার ঘষে, শুধুমাত্র আগুনের শিখাগুলোকে মুছে দিয়েছে চিতার গা থেকে।

কিন্তু ও কী? চিতাটার কাঠগুলো একটু নড়ে উঠল না? হ্যাঁ, তা-ই তো... না হলে আগুনের ফুলকিগুলো আচমকা...

সুমেশের বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে। মনে হচ্ছে, সে যেন শ্বাস নিতে ভুলে যাচ্ছে। নিজের চোখে এ কী দেখছে সে? যা দেখছে তা সত্যি তো... নাকি সবটা মিথ্যা। সুমেশ স্পষ্ট দেখল, চিতার গনগনে লাল কাঠগুলো চিতা থেকে দু-একটা খসে পড়তেই চিতার ভেতর থেকে উঠে বসল একটা নারীদেহ। হ্যাঁ, ঠিক পড়ছেন। জ্বলন্ত চিতার ভেতরে উঠে বসল এক নারীদেহ। কুচকুচে কালো চামড়ায় চিতার আগুনের আভা পড়ে একটা উজ্জ্বল কমলা আভা তৈরি হয়েছে শরীর জুড়ে। নগ্ন শরীর, কিন্তু কী ভয়ংকর দেখতে। মুখ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, কারণ মুখের সামনে পড়ে রয়েছে একঢাল কালো চুল। মেয়েটি চিতা থেকে উঠে বসতেই, চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে একটা বিশ্রী, চামড়া-পোড়া কটু গন্ধ। কিন্তু এই আগুনে মেয়েটির কিছুই হচ্ছে না। কিছুই না। সে ঘাড় ঘুরিয়ে কিছু একটা খোঁজার চেষ্টা করছে। বিশেষ কাউকে যেন...

শ্মশানে উপস্থিত সকলে হাঁ হয়ে দৃশ্যটার দিকে দেখছে। প্রবল আতঙ্কে কারও মুখে কোনও কথা নেই। নিশ্বাসটুকুও নিতে অনেকে ভুলে যাচ্ছে। এ কী দেখছে তারা? কী দেখছে? এদিকে সুমেশের ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা যেন লোপ পাচ্ছে ধীরে ধীরে। এক ভয়ংকর দেখতে নগ্ন নারী চিতার ওপরে উঠে বসেছে। কিন্তু এ কে? এ তো পিসিমা নয়? শরীর দেখে তো অন্য মনে হচ্ছে, এ কোনও যুবতি। কে এ?

আচমকা মেয়েটির চুলে ঢাকা মুখ সুমেশের দিকে তাকিয়ে থেমে গেল। তারপর ওই অবস্থাতেই, মেয়েটি ঘাড় একদিকে হেলিয়ে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে রইল। কয়েক মুহূর্ত মাত্র, কিন্তু তারপরেই মেয়েটি ধীরে ধীরে উবু হয়ে বসল চিতার ওপরে। শুধুমাত্র পায়ের পাতা আর হাতের চেটোর ওপর পুরো শরীরের ভারটা রেখে ঘাড়টা ঝুঁকিয়ে দিল সামনের দিকে। ভঙ্গিটা ঠিক যেন শিকারি চিতা। যে-কোনও মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়তে পারে সামনের ওপর। ওদিকে হু হু করে চিতা থেকে বেরিয়ে আসছে আগুনের ফুলকি। স্পষ্ট কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিচ্ছু না। দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র মেয়েটির ওই ভয়ংকর শরীরটা।

মেয়েটি এবার অন্যদিকে ঘাড় কাত করল। মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সুমেশ স্পষ্ট টের পাচ্ছে, চুলের ওপারে থাকা একজোড়া ভয়ংকর চোখ তার দিকে তাকিয়ে আছে। শুধু তাকিয়ে নেই, সেই একজোড়া চোখ যেন তাকে গিলে খাচ্ছে। এরপর? এরপর কী? ও সুমেশের ওপর লাফিয়ে পড়বে নাকি? আর এটা ভাবতেই, একটা ঠান্ডা শীতল স্রোত মেরুদণ্ড দিয়ে ক্রমশ নীচের দিকে নেমে গেল।

কিন্তু না, মেয়েটি লাফাল না... বরং সঙ্গে সঙ্গে চিতার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একঝাঁক ধোঁয়ার কুণ্ডলী। গরম কাঠের ওপর জল ঢাললে যেমন ধোঁয়া বের হয়, এ-ও ঠিক তেমনিই। কয়েক মুহূর্তমাত্র, ধোঁয়াটা ঘিরে ধরল মেয়েটার শরীর। আর সঙ্গে সঙ্গে ছিল থেকে নেই হয়ে গেল সে। এক মুহূর্তে, সেই ভয়ংকর শরীর কর্পূরের মতো গায়েব হয়ে যেতেই। ঝুপ করে আবার সাদা আলোটা জ্বলে উঠল মাথার ওপর।

এখন আবার সব স্বাভাবিক। মাটি ভেজা। বোঝা যায়, বৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু কোনও রক্তবৃষ্টি নয়। সামনেই পড়ে-থাকা প্লাস্টিকের ওপর জমা সাদা জল সাধারণ বৃষ্টির প্রমাণ দিচ্ছে। ওদিকে চিতাখানাও দাউদাউ করে জ্বলছে। কোনও বিকৃতি নেই।

সুমেশ অবাক হয়ে শ্মশানে উপস্থিত বাকিদের মুখের দিকে তাকাল। তারাও

অবাক হয়েছে। সুমেশ নিজে ধন্দে রয়েছে। সে বুঝতে পারছে না, একটু আগে যা দেখল, তা সত্যি সত্যি দেখল? না ভ্রম দেখল? নাকি অন্য কিছু...

"কী ভাবছিস? একটু আগে যা দেখলি... তা মিথ্যে কি না?"

বয়স্ক লোকটি সুমেশের মুখোমুখি উঠে বসেছে, "তুই যা দেখলি, ওরা যা দেখল, সব সত্যি। তা সব সব সত্যি। সব।"

"মানে?" সুমেশের মুখ হাঁ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত আগেও সে ভাবছিল, এসব হয়তো মিথ্যে... কিন্তু...

"মানে... হিঃ হিঃ হিঃ।" সুমেশের কথা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল বুড়ো লোকটা। তারপর গলার স্বর নামিয়ে, সুমেশের কানের কাছে মুখ এনে, খুব ধীরে ধীরে বলে উঠল, "মড়ির দেহমুক্তি ঘটেছে। মড়ি ফিরে এসেছে। ফিরে এসেছে মড়ি...। হিঃ হিঃ হিঃ!"

(৩)
মড়ি খায় চিবিয়ে

গতকালকের মতো, আজকেও গোটা পাড়া জুড়ে লোডশেডিং হয়েছে। সারা পাড়া জুড়ে একটা গুমোট অন্ধকার যেন আটকে রয়েছে। একটু আগেও হেমন্তের হাওয়া ছিল বাইরে। এখন সেসব অনুপস্থিত। কিছুক্ষণ আগের আচমকা বদলে-যাওয়া কমলা আকাশ এখন ধূসর কালো রঙে চারদিক ডোবা।

এমার্জেন্সিটা অনেকক্ষণ আগেই দেহ রেখেছে। সুমিতা দেবী একটু আগেই একটা হ্যারিকেন রেখে গিয়েছেন ঘরের এককোণে। তারই ঈষৎ হলদেটে আলো ছড়িয়ে পড়ছে ঘরের কোণে কোণে। মশারির ভিতর খাটের ওপরে বসে বসে, সেই আলোর দিকে তাকিয়ে রয়েছে বীথি। কিছু একটা ভাবছে। হয়তো আগের জীবনের কথা, হয়তো এই জীবনের কথা। বীথির পূর্বস্বামী ধীরাজ, লম্বাচওড়া, ডাকাবুকো মানুষ ছিলেন। বাবা হিসেবে কতটা সফল ছিল

ধীরাজ তা যাচাই করে দেখার খুব একটা বেশি সময় পায়নি বীথি। কিন্তু স্বামী হিসেবে ধীরাজের থেকে নিকৃষ্ট কাউকে সে কখনোই কল্পনা করতে পারবে না। খানিকটা মস্তান গোছের মানুষ ধীরাজ, বীথিকে দিয়ে কী করায়নি? মারধর করে, নেশা পর্যন্ত করিয়েছে। এমনকি, কোনও কারণ ছাড়াই, নিজের আর বীথির অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল সাইটে ভাইরাল পর্যন্ত করেছে শুধু বীথিকে অপদস্থ করবে বলে। বীথি প্রথমে সংস্কৃতিজগতের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিন্তু এইসব জিনিস ভাইরাল হতেই, সকলেই তার সঙ্গে এক নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখতে শুরু করে। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবনের ছাত্রী ছিল সে। এক উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ হতে পারত তার, কিন্তু গ্রহের ফেরই বলুন বা অন্য কিছু, তার জীবন জুড়ে যায় ধীরাজের সঙ্গে।

বিয়ের এক বছরের মাথায় টুপাইয়ের জন্ম। আর আনুষঙ্গিক যা যা কিছু। সেই ধীরাজের মৃত্যুও হয় আকস্মিকভাবে। সম্ভবত নিজেরই কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী দলের কারও হাতে। এই মৃত্যুর পর বীথি ভেবেছিল, সে নতুন করে সব কিছু আবার শুরু করবে। করেওছিল। কিন্তু সেইভাবে আর হল কোথায়।

সুমেশ ভালো মানুষ। তবে দুর্বল চিত্তের। পুরুষমানুষের শক্ত মেরুদণ্ড বলতে যা বোঝায়, তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা বলতে যা বোঝায় তা সুমেশের কোনওকালেই ছিল না। একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে গিয়েছে আগের ভুল থেকে কোনওরকম শিক্ষা না নিয়েই। নিজের জীবন নিয়ে ঝুঁকি তো নিয়েইছে, সেই সঙ্গে ঝুঁকিতে ফেলেছে বীথি আর টুপাইয়ের জীবনও। এই যে আজ কলকাতা শহর ছেড়ে এখানে, এই মফস্‌সলে এসে উঠতে হয়েছে, সে-ও তো ওই ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই।

আধো অন্ধকার ঘরে বসে এসবই ভাবছিল বীথি, ঠিক এমন সময় খুব কাছেপিঠে কতগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠতেই ভাবনা ছিন্ন হল তার। পাশেই শুয়ে রয়েছে টুপাই। সন্ধ্যা থেকেই হঠাৎ করে জ্বর। রাত যত বাড়ছে, জ্বরের প্রকোপ পাল্লা দিয়ে বাড়ছে। একটু আগেই মাথায় জলপটি দিতে জ্বরটা একটু কমেছিল।

বীথি টুপাইয়ের কপালে হাত রাখল। জ্বরটা আবার বাড়ছে। সকালের এত অশান্তির পরেও, সুমিতা এসে বারকয়েক খোঁজ নিয়ে গিয়েছে টুপাইয়ের। ওষুধও দিয়ে গিয়েছে। বলেছে জ্বর বাড়লে খাওয়াতে। কিন্তু সন্ধ্যা থেকে তেমন ভারী কিছু খায়নি টুপাই। অন্তত কিছু মুখে না দিলে, জ্বরের ওষুধটা খাওয়ানো উচিত হবে না।

ঠোঁট কামড়ে একবার ঘড়ির দিকে তাকাল বীথি। একটু আগেই এগারোটার ঘণ্টা পড়েছে ঘড়িতে। এতক্ষণে সুমেশদের ফিরে আসা উচিত ছিল। এখন একলা টুপাইকে ঘরে রেখে, রান্নাঘর থেকে কিছু খাবার জিনিস আনবে কী করে? কিন্তু আবার না গিয়েও তো উপায় নেই। সুমিতা দেবীর ঘর নীচের তলায়। এখান থেকে ডাকলে শুনতে পাওয়ার কথা নয়। ওপরের তলায় টুপাইকে নিয়ে সে একলাই। ডানদিকের সিঁড়ির পাশের ঘরে বুড়ি থাকত, কিন্তু গতকাল থেকে সেই ঘরও ফাঁকা।

বীথি মশারি তুলে ধীরপায়ে বিছানা থেকে নেমে এল। তারপর হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে, দরজার বাইরে বেরোনোর আগে, একবার ঘুমন্ত মশারির ভেতরে ঘুমন্ত টুপাইকে দেখে তাড়াতাড়ি বারান্দায় বেরিয়ে এল। কিন্তু বাইরে বেরোতেই, বীথির বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁত করে উঠল। এই বাড়িটা খানিকটা ইংরেজি অক্ষর 'এল' আকৃতির। দোতলা থেকে একতলা যাওয়ার সিঁড়িটা ঠিক 'এল'-এর পেটের কাছের ভাঁজ বরাবর। আর বীথিরা এখন যে ঘরে রয়েছে, সেটা 'এল'-এর এক প্রান্তে হলে ছাদে যাওয়ার সিঁড়িটা দোতলার আরেক প্রান্তে। স্কুলবাড়ির মতো দেখতে এই বাড়িটার দোতলার চওড়া বারান্দার একদিকে লোহার গ্রিল দিয়ে ঘেরা। আর অন্যদিকে পরপর সারি-দেওয়া ঘর।

গতকালকেও লোডশেডিং হয়েছিল। ঠিক একই রকম অন্ধকার ছিল গতকালও। কিন্তু আজকের মতো, এই অনুভূতিটা গতকাল ছিল না। নীচের ঘরে ভাড়াটে, মুনিয়ার বাবা, কাছেপিঠেরই একটি কারখানায় সিকিউরিটি গার্ডের কাজ করে। আজ বোধহয় ভদ্রলোকের নাইট ডিউটি রয়েছে। তাই

ওদের ঘরও অন্ধকার। আজকে চারদিক বড় বেশি চুপচাপ। বড় বেশি নিঝুম হয়ে রয়েছে। একটু আগে ঘেউ ঘেউ করা কুকুরগুলোও এখন আর ডাকছে না। বড় বেশি অন্যরকম আজকের এই পরিস্থিতি। বা হয়তো, এটা শোকের বাড়ি বলেই এত বেশি অন্যরকম লাগছে। কথায় বলে না, মৃত্যুর পরে আত্মা তিন দিন নাকি তার শেষ বাসস্থান ছেড়ে নড়ে না। এমনও হতে পারে, বুড়ির আত্মা আশপাশে রয়েছে বলেই তার এমনটা মনে হচ্ছে।

কথাটা ভাবতেই তার হাসি এল। ইশ্! কী সব ভাবছে সে। সে বুড়ি আর এখানে কোথায়? তার শরীর তো কবেই পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। ঠিক এসবই ভাবতে ভাবতে নিহারিণী দেবীর ঘরটা পেরোচ্ছিল বীথি। এই ঘরে সন্ধ্যার পরে মুনিয়ার মা একটা প্রদীপ জ্বালিয়ে গিয়েছিল। সেই প্রদীপ এখনও জ্বলছে। সেই প্রদীপের আলোয় একবার বেখেয়ালে ঘরের ভেতরে তাকাতেই, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো থমকে গেল বীথি।

এক মুহূর্তের জন্য তার মনে হল, খাটের ওপরে বুড়ি উবু হয়ে বসে রয়েছে। শুধু বসে নেই। একদিকে ঘাড় কাত করে একটা শব্দহীন হাসিও হেসে চলছে। কিন্তু সেটা কয়েক মুহূর্তের জন্যই। দাঁড়িয়ে চোখ কচলে আবার তাকাল ঘরের দিকে। নাহ্, এখন তো আর কিছু নেই। তাহলে?

বুকের ভেতরে একটা অন্যরকম ধুকপুকুনি টের পেল বীথি। এসব তো এর আগে তার সঙ্গে কখনও হয়নি, তাহলে আজ কেন?

দেরি না করে, দ্রুতপায়ে নীচে নেমে এল বীথি। ভেবেছিল, ম্যাগি বানাবে টুপাইয়ের জন্য। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে প্রয়োজন নেই। ফ্রিজে দুধ আছে। একটু গরম করে বিস্কুট খাইয়ে দেবে।

বীথি দেরি না করে দ্রুতহাতে রান্নাঘরের কাজ শুরু করল। কিন্তু সে নতুন এখানে। কোথায় কী জিনিস থাকে, সে এখনও অভ্যস্ত নয়। তারপরেও সে চেষ্টা করল দ্রুত কাজ শেষ করতে। টুপাই ওপরে একলা...

"ঠক ঠক ঠক..."

বাইরের দরজায় একটা টোকার শব্দ পড়ছে না?

"কে?" বীথি গ্যাসে দুধটা চাপিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

আবার "ঠক...ঠক...ঠক..."

"কে আছে বাইরে?"

"আমি, দরজা খোলো।" বীথির ধড়ে যেন প্রাণ এল। সুমেশের গলা।

বীথি সদর দরজা খুলতে খুলতে গজগজ করে উঠল, "কী ব্যাপারটা কী? এতক্ষণ সময় লাগে..." কথা বলতে বলতেই থমকে গেল সে... হ্যারিকেনের আলো দরজা ছাপিয়ে সামনের অন্ধকার রাস্তায় গিয়ে পড়ছে। কই, দরজার বাইরে তো কেউ নেই! ফাঁকা রাস্তা। কিন্তু সে যে স্পষ্ট সুমেশের গলা শুনল।

বুকের ভেতরে অন্য রকমের একটা ধুকপুকুনি টের পাচ্ছে বীথি। নাহ, কিছু একটা গণ্ডগোল আছে। একদিনে তার এত ভুল হওয়ার কথা নয়। দ্রুতহাতে দরজাটা লাগিয়ে রান্নাঘরে ফিরে এল। গ্যাসটা বন্ধ করা দরকার। দুধ গরম হলে ভালো... নইলে ঠান্ডা দুধই...

কথাটা ভাবতে ভাবতেই বীথি রান্নাঘরে ঢুকে আবার থমকে গেল।

এ কী? গ্যাস বন্ধ কেন? আর গ্যাসের ওপরে যে দুধের জায়গা বসিয়েছিল গরম করবার জন্য, সেই দুধের জায়গা কোথায়...? বীথি এক মুহূর্ত দেরি না করে সটান ফ্রিজের দরজাটা খুলে দিল। হ্যারিকেনের আলোটা ফ্রিজের ভেতরে পড়তেই বীথি থম মেরে গেল কয়েক মুহূর্তের জন্য। ফ্রিজের মধ্যে দুধের বাটিটা একইভাবে রাখা। কিন্তু সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, বাটি থেকে গরম ধোঁয়া এখনও বেরোচ্ছে। অর্থাৎ...

নাহ্! নাহ্... আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। বীথি দ্রুতহাতে ফ্রিজের দরজাটা লাগিয়েই রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি ভেঙে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল। চারদিকে ঘোর অন্ধকারের মধ্যে বীথি যেন টের পাচ্ছে, কেউ ঠিক ওর সঙ্গে সঙ্গে ওর পিছেই এগিয়ে আসছে। কিছু গণ্ডগোল আছে এখানে। আছেই। সুমেশ আসুক। তারপর যা হওয়ার হবে... এখন সে ঘরের দরজা লাগিয়ে আপাতত...

ঘরের মধ্যে ঢুকেই, সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা ভেতর থেকে লাগিয়ে দিল বীথি। এতক্ষণ সে প্রায় দম আটকে নীচের তলা থেকে ওপরে উঠে এসেছে। এবার একটু নিশ্চিন্তের শ্বাস নিচ্ছে সে। বন্ধ দরজার ভেতরে সে আর তার ছেলে নিরাপদ রয়েছে... কথাটা ভাবতে ভাবতেই সে যেই বিছানার দিকে এগোল, বীথির মনে হল, কেউ যেন তার সারা শরীরটা ঠান্ডা জলে চুবিয়ে দিচ্ছে একটু একটু করে।

হ্যারিকেনের হলুদ আলোয় দেখা যাচ্ছে, মশারি খুলে বিছানার একদিক থেকে ঝুলে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। আর, মেঝের ওপর সটান দাঁড়িয়ে রয়েছে টুপাই। হাত-পা টানটান। চোখের শূন্যদৃষ্টি সামনের দিকে বিস্ফারিত। কপালে দেওয়া জলপট্টির কাপড়টা একদিকে খুলে ঝুলে পড়ছে।

"টুপাই? টুপাই? কী হয়েছে? এরকম করে দাঁড়িয়ে আছ কেন?" মেঝের ওপর হ্যারিকেনটা রেখে ছেলের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল বীথি। জ্বর কি অনেকটা বেড়েছে? এরকম করছে কেন টুপাই?

"কী হয়েছে, বাবা? মশারি খুলল কে? শরীর খুব খারাপ করছে?"

কথাটা বলতে বলতেই ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরল সে।

ঠিক এমন সময় কানের কাছে ফিশফিশ করে কী যেন বলে উঠল টুপাই। বীথি কথাটা শুনতে পেল না।

"কী হয়েছে, টুপাই? কী বলছ?"

টুপাই শ্বাস টানার মতো ফিশফিশিয়ে বলে উঠল, "মড়ি... খায়... চিবিয়ে...।"

"কে খায় চিবিয়ে?" বীথি বুঝল, ছেলে জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।

"ওই যে, এসে মশারি খুলে... আমায় এখানে দাঁড় করিয়ে দিল।"

"এসব কী বলছ টুপাই?" বীথি ছেলের কথা কিছুই বুঝতে পারল না—"কে মশারি খুলে দিল? কে দাঁড় করিয়ে দিল তোমায় এখানে?"

টুপাই মায়ের মুখের দিকে তাকাল। কিন্তু কোনও কথা বলল না। বদলে

ধীরে ধীরে ডান হাতের তর্জনী বীথির মাথার পিছনদিকে ইঙ্গিত করতেই, বীথি চমকে পিছন ঘুরল, আর যা দেখল, তাতে মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড শীতল একটা স্রোত ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড বরাবর ক্রমশ নীচের দিকে চলে গেল।

বীথির পিছনদিকের দেওয়ালটা অন্ধকার। কিন্তু এই অন্ধকারেও সে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সেই কার্নিশের মাথা থেকে একজোড়া কালো কুচকুচে পা নীচের দিকে ঝুলছে। ঠিক যেরকম করে নিহারিণী দেবীর পা ঝুলছিল অ্যাম্বুলেন্সের মাথা থেকে। পার্থক্য শুধু একটাই, সেই পা স্থির ছিল। আর এই পা দোল খাচ্ছে। ঠিক ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো করে... টিক টক... টিক...টক....

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই হ্যারিকেনের আলোটা নিবে, গোটা ঘর অন্ধকারে ডুবে গেল। আর সারা বাড়ি জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল বীথির সুতীব্র চিৎকার।

* * * * * * * * * *

"আপনি নিশ্চিত? সত্যি সত্যি এই ঘরে আপনি কাউকে দেখেছিলেন?"

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কথাটা বলে উঠলেন অপরেশবাবু। পরনে তাঁর জগিং-এর পোশাক। মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে তাঁর আচমকাই মনে হয়েছিল, একবার দেখা করে যান সুমেশের সঙ্গে। সেই ভেবেই এখানে আসা। হেমন্তের সকালের শীতল রোদ ঘরের জানালা গলে ঠিক অপরেশবাবুর পায়ের কাছে এসে পড়েছে। ঘরের একপাশে একটা চেয়ারের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে সুমেশ। দুই রাত না-ঘুমোনো চোখজোড়া জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে রয়েছে। চেহারা উদ্ভ্রান্তের মতো। কাল রাতে পোশাক ছেড়ে, স্নান সেরে সে ধোয়া পোশাক পরেছে। এখানকার নিয়ম অনুযায়ী চার দিন পর সাদা থান পরিধান করতে হয় অগ্নিকর্তাকে। সুমেশ কাল রাতে বাড়ি ফিরে বীথিকে আবিষ্কার করেছে এই ঘরেরই মেঝের ওপর সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে। টুপাই বিছানার ওপর মশারির ভেতরে জ্বরে

বেহুঁশ। অনেক কষ্টে বীথিকে জাগানো হলে সে যা জানায়, তাতে সুমেশের কপালের ভাঁজ গাঢ় হয়ে ওঠে। সে নিজেও যে যে ঘটনার সাক্ষী, সেগুলো সবিস্তারে বীথিকে জানানোর পর থেকেই বীথি কেমন থম মেরে রয়েছে। তারপর থেকে ওরা দুজনেই নির্ঘুম রাত কাটিয়েছে। সুমেশ একবার তাকাল বীথির দিকে। খাটের ধারে বসে রয়েছে সে চুপ করে। হয়তো ভেতরে ভেতরে কিছু একটা ক্যালকুলেট করবার চেষ্টা করছে।

"নাহ্। মানে এমনও তো হতে পারে, আপনি কাউকে হ্যালুসিনেট করেছেন? অনেক সময় আমরা স্ট্রেসে থাকলে এমন করি..."

"পরপর এতগুলো ঘটনা হ্যালুসিনেট?" এতক্ষণ পরে বীথি অবাক হয়ে মুখ খুলল, "কীভাবে?"

"হতে পারে, অসম্ভব নয়। তার প্রমাণ আপনি যা দেখেছেন, আপনার স্বামী ফিরে এসে কিন্তু তা দেখেননি। আপনার সঙ্গে ঘটনাটা ঘটেছিল ওই এগারোটা নাগাদ। আর উনি ফিরে এসেছিলেন সওয়া এগারোটা নাগাদ। এই কম সময়ের মধ্যে এসে আপনি যেরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে ওঁর বর্ণনা মিলছে না। আপনি বলেছেন, মশারি খোলা ছিল, আর আপনাদের ছেলে নাকি দাঁড়িয়ে ছিল। অথচ উনি এসে দেখেছেন, মশারি টাঙানোই ছিল। আর আপনাদের ছেলে বিছানায় শুয়ে ছিল। এর মাঝেই উনি রান্নাঘরে গিয়েছিলেন, সেখানে ফ্রিজের দুধের জায়গা কিন্তু ঠান্ডাই ছিল। ফ্রিজ চললেও নইলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু মনে রাখতে হবে, সেই সময় লোডশেডিং ছিল। দুধের পাত্র অত দ্রুত ঠান্ডা হওয়ার উপায় ছিল না।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন..."

"এগুলো সবই হ্যালুসিনেশন। কাল সারাদিন ওই গালগল্পগুলো এতই শুনেছেন, যে কোথাও গিয়ে ওগুলো আমাদের মাথার মধ্যে বসে গিয়েছে। এগুলো তারই পোস্ট এফেক্ট।"

"আর আমার?"

এবার কথা বলে উঠল সুমেশ, "আমি কাল শ্মশানে যা দেখলাম। বাকিরা

যেটা দেখল...।”

“দেখুন, বাকিরা নেশা করেছিল কি না, সেটা জানতে হবে। আমার মনে হয়, আপনারও সেম কেস। হ্যালুসিনেশন। স্ট্রেস কখন যে কীভাবে... আপনারা শহুরে শিক্ষিত মানুষ। আপনাদের এই ধরনের কুসংস্কারকে প্রশয় দেওয়া উচিত না।”

“অমুয়ারা যা বলেছে তা মিথ্যে নয়, স্যার। মড়ি নামের এক ভয়ংকরী সত্যি সত্যিই রয়েছে।” ঘরের একপাশে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন সুমিতা দেবী।

“আমার মা-ঠাকুমারা আমাদের বারবার মড়ির গল্প শুনিয়েছে। এটা ঠিক যে, মড়ি মড়া খায়। কিন্তু যখন তার দেহমুক্তি ঘটে, তখন সে যে কারও রূপ ধরতে পারে। গলা নকল করতে পারে। হয়ে ওঠে আরও ভয়ংকরী। সে তখন শুধু মড়িক্ষণের মড়াতেই ক্ষান্ত থাকে না। সে তখন জ্যান্ত মানুষ খায়। এমনকি হাড়গুলোও চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। ফেলে যায় শুধু মাথার চুলগুলো। এ-ও বলে, মড়ি যে বাড়িতে যায়, সেই বাড়ির মাংস না খেয়ে ফেরে না, স্যার। অমুয়াদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে বলতে হবে, আমরা খুব তাড়াতাড়িই এমন কিছু দেখতে চলেছি।”

“থামুন! থামুন! অল, বুলশিট! কী সব বলছেন? আপনার কথা যদি সত্যি হয় আর কাল যদি সত্যি সত্যি মড়ি এই বাড়িতে এসে থাকে তাহলে টুপাই আর বীথি দেবী তো সুস্থই রয়েছেন। আচ্ছা, আপনিই সেই মানুষ না, যিনি নিহারিণী দেবীর দেখাশোনা করতেন? উম্মম... আই সি...” বিরক্ত মুখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন অপরেশবাবু। “আমার পরামর্শ যদি নেন, তাহলে বলব, এঁর কাজ মিটে গেলে এঁকে আর রাখার কোনও দরকার নেই। এই ধরনের নেগেটিভ ভাইভস ক্রিয়েট করা মানুষকে আশপাশে রাখবেন না।”

অপরেশবাবুর শেষের কথাটা ছিল বীথির উদ্দেশে।

উত্তরে বীথি কিছু বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তার আগেই নীচের তলা থেকে... একটা ভয়ংকর চিৎকার। চমকে উঠল ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে।

চিৎকারটা নীচের তলা থেকে আসছে।

ওরা সকলেই একে অপরের মুখের দিকে তাকাল এক মুহূর্তের জন্য। তারপর দ্রুতপায়ে ছুটে এল নীচের তলায়। ইতিমধ্যেই, রাস্তা দিয়ে যারা যাতায়াত করছিল, এই চিৎকার শুনে ঘরের মধ্যে ঢুকে এসেছে।

বীথি, সুমেশ, সুমিতা দেবী, অপরেশবাবু নীচের তলায় এসে দেখলেন, মুনিয়ার বাবা শিবশংকর পাসোয়ানের সাইকেল একপাশে দাঁড় করানো। ভদ্রলোকের কাল রাতে নাইট ডিউটি ছিল। সবেমাত্রই ফিরে এসেছেন। কিন্তু উনি নিজের ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে এইভাবে চিৎকার করছেন কেন? আর ওইভাবেই বা থরথর করে কাঁপছেন কেন?

সুমেশের বুকের ভেতরটায় কে যেন হাতুড়ির বাড়ি মারছে খুব জোরে জোরে। সে দেরি না করে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল শিবশংকর পাসোয়ানের রুমের দিকে। মাত্র কয়েক পা এগিয়েছে, আর ঠিক তখনই তার চোখ পড়ল ঘরের ভেতরের দৃশ্যে।

আর সেটা দেখেই সুমেশের মনে হল, এই সকালবেলাতেও সারা বাড়ি জুড়ে যেন রাতের আঁধার নেমে এসেছে। সে স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে, ঘরের ভেতরটা চাপ চাপ রক্তে ভেসে যাচ্ছে। রক্ত-মাখা পোশাক দলা হয়ে মেঝেরই একপাশে পড়ে রয়েছে।

আর সারা ঘর জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে দু-রকমের গোছা গোছা চুল। এ চুল চুল নয়, মড়ির উচ্ছিষ্ট।

(চতুর্থ খণ্ড)

(১)

অমুয়ারা আসলে...

"ঠক ঠক ঠক..."

খুব মৃদু স্বরে একটা শব্দ হচ্ছে। একটানা নয়... একটু থেমে থেমে।

দু-চোখের পাতায় হালকা তন্দ্রা নেমে এসেছিল সুমেশের। আচমকা এই বিসদৃশ শব্দে তন্দ্রাটা চটকে গেল তার। চমকে উঠে বসেই খেয়াল হল, শব্দটা আসছে তার ঘরেরই বন্ধ দরজা হতে।

ঘরের মধ্যে এই মুহূর্তে একটা উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। মাথার ওপর ফ্যানটাকে বন্ধ করে রেখেছে সে। রাত বাড়লেই এদিকটা ভালোই ঠান্ডা পড়ছে। সুমেশ একবার অভ্যাসমতো বিছানার দিকে তাকাল। কিন্তু বিছানা ফাঁকা। গত দু-দিন হল টুপাই হাসপাতালে। বেশ অনেকদিন ওর জ্বর না-কমায়, অবশেষে সুমেশ বাধ্য হয়েছে তাকে হাসপাতালে দিতে। তার নিজের অবশ্য ইচ্ছে ছিল না এইটুকু বাচ্চাকে হাসপাতালে পাঠানোর, কিন্তু সে নিরুপায়। সেদিনের পর থেকে এই এলাকার লোকেরা তাদের একঘরে করে রেখেছে প্রায়। কথা তো বলছেই না। বরং ধোপা, নাপিত, বাজার, হাট, ডাক্তার, পথ্য—সব পরিষেবা বন্ধ করে দিয়েছে। অবশ্য এদেরই আর দোষ কী? সেদিনের পর থেকে যা হচ্ছে পুরো এলাকা জুড়ে...

সেদিনের পর গত নয় দিন হল এই জায়গা জুড়ে যেন মৃত্যুমিছিল শুরু হয়েছে। ঠিক মৃত্যুমিছিল না, মৃত্যু তো তখনই ধরা হবে, যখন দেহ খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু কোথায় দেহ? এখানে তো কিছুই পাওয়া যায় না। পড়ে থাকে চাপ চাপ রক্ত, রক্তে ভেজা পোশাক আর গোছা গোছা চুল। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, যুবক, বাচ্চা—কেউ বাদ যাচ্ছে না মড়ির ক্ষুধা থেকে। হাড়সুদ্ধ চিবিয়ে খাচ্ছে সেই ভয়ংকরী। লোকেরা থেকে থেকেই উবে যাচ্ছে যেন। কার পালা কখন আসবে, কেউ জানে না। সন্ধ্যা হলেই ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে লোকেরা আশ্রয় নিচ্ছে ঘরের ভেতরে। মৃত্যু আতঙ্ক বুকে চেপে পাঠ করে চলছে সপরিবারে মড়ির ছড়া...

"অসত কালী বসত কালী
কালীর পদে ধরি।
আনমনেতে দিস না সাড়া
আসবে ছুটে মড়ি।।
এলান পাথর, বেলান পাথর
পাথর মেরে কানা।
মড়ি তোকে এই ঘরেতে
আসতে করি মানা।"

কিন্তু তাতেও কি রেহাই আছে? নাহ্, নেই। এই মন্ত্রে মড়ির হাত থেকে বাঁচার কোনও উপায় নেই। অনেকে ভেবেছিল, এখান থেকে চলে গেলে বোধহয় মড়ির প্রকোপ থেকে বাঁচা যাবে। দু-দিন আগে পাড়ার প্রবীণ ব্যক্তি সোমেশ্বর সাউ সপরিবারে এখান থেকে সরে, ডালখোলায় নিজের বোনের বাড়িতে গিয়ে উঠেছিল। ভেবেছিল, এই করে বুঝি বাঁচা গেল। কিন্তু কোথায় কী? কালকেই সুমেশের কানে এল, সোমেশ্বর সাউ আর তার পাঁচ বছরের নাতিও নাকি মড়ির ভোগে পরিণত হয়েছে। অবশিষ্ট হিসেবে সে ফেলে গিয়েছে দাদু আর নাতির মাথার চুল। এবার আপানরাই বলুন, এত কিছু যে মানুষের জন্য শুরু হয়েছে, তাকে লোকেরা কেন ছেড়ে দেবে? কম বারণ

তো করা হয়নি। কিন্তু সুমেশের সম্পত্তি পাওয়ার লোভ...

"ঠক...ঠক...ঠক..."

আবার সেই শব্দ। টানটান করে সোজা হয়ে বসল সুমেশ। নাহ্, "কে আছে দরজার বাইরে?" বা "কে?" এসব কিছু বলা যাবে না এখন। ধীরপায়ে দরজার কাছে মুখ এনে বলে উঠল, "মড়ি মড়ি মড়ি..."

আর ঠিক তারপরেই দরজার উলটোদিক থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠে ভেসে এল—"মড়ার মাথায় নড়ি..."

এবার আর দেরি করল না সুমেশ। দ্রুতহাতে দরজাটা খুলতেই, ঘরের ভেতরের সাদা আলোর কিছুটা অংশ বারান্দায় গিয়ে পড়ল। আর সেই আলোয় দেখা গেল, গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সুমিতা দেবী। চোখে-মুখে কীসের যেন উৎকণ্ঠা।

"কী ব্যাপার? এত দেরি হল?" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সুমেশ উদ্‌বিগ্ন স্বরে প্রশ্নটা করতেই সুমিতা দেবী ঠোঁটে আঙুল ঠেকালেন। "শশশশ... আস্তে কথা বলুন... সে শুনে ফেলবে।"

সুমেশ টের পাচ্ছে, সুমিতা দেবীর ব্যবহার কেমন যেন অপ্রকৃতিস্থ। দিন যত যাচ্ছে, তার এই অবস্থা যেন তত বাড়ছে। অবশ্য তারই বা আর দোষ কী? যা অবস্থা চলছে এখানে, সুমেশের নিজের মাথা যে এখনও খারাপ হয়ে যায়নি, এই অনেক। সুমেশ লক্ষ করল, কথাটা বলেই কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন মহিলা।

"আমরা বেরোব তো?" সুমেশ ফিশফিশিয়ে কথাটা জিজ্ঞাসা করে উঠতেই মহিলার যেন ঘোর ভঙ্গ হল।

"হ্যাঁ, বেরোব। আসুন।"

সুমেশ দেরি না করে, ঘরের বাইরে বেরিয়ে দরজাটা প্রায় শব্দ না করে ভেজিয়ে দিল। তারপর দ্রুতপায়ে সুমিতা দেবীকে অনুসরণ করল। বারান্দাটা অন্ধকার। এমনকি ঘরের বাকি অংশও। যবে থেকে এসব শুরু হয়েছে, তবে থেকেই যেন অজানা কারণে রাস্তার বাতিগুলো জ্বলে না। সন্ধ্যা নামলেই,

গোটা এলাকা জুড়ে যেন মৃত্যুর অন্ধকার নেমে আসে। অন্ধকার নেমে এলেই সকলে দম আটকে অপেক্ষা করে, এটা জানার জন্য যে আজ কার পালা? অন্যের বাড়ি থেকে চিৎকার, আর্তনাদের শব্দ পেলে, নিশ্চিন্ত হয় লোকজন। যাক, আজকের মতো ফাঁড়া কেটে গিয়েছে এই পরিবারের। মনে মনে শান্তি নেমে আসে অন্যের বাড়ি কান্নার শব্দ শুনে। আপনার মনে হতে পারে, মানুষ এত ঘৃণ্য কেন? কিন্তু এটাই বোধহয় বাস্তব। এমন পরিস্থিতিতে আপনি-আমি পড়লে হয়তো আমরা এমনটাই চাইতাম, যদি বিপদ আসেই তাহলে তা যেন আমার বাড়ি না এসে, অন্যের বাড়ির দিকে ঘুরে যায়। বিপদে পড়লে মানুষের লুকোনো প্রবৃত্তিগুলো আপনা থেকেই বেরিয়ে পড়ে।

সুমিতা দেবী দ্রুতপায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। যেন কিছুর তাড়া রয়েছে। হাতে একটা সরু টর্চের আলো, যেটা তিনি মাঝে মাঝে জ্বালাচ্ছেন। দেখতে দেখতেই ওরা দুজনে দোতলা থেকে একতলায় নেমে এল। কিন্তু সুমেশ যেই সদর দরজার দিকে এগোতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে সুমিতা দেবী তার হাত আঁকড়ে ধরলেন, "ওইদিকে কোথায় যাচ্ছেন?"

"কেন? আমরা ওইদিক থেকে বেরোব না?" অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ফিশফিশ করে কথাটা বলে উঠতেই সুমিতা দেবী ফস করে উঠলেন, "পাগল হয়ে গেলেন নাকি? সামনে দিয়ে গেলে ও দেখে নেবে না?" কথাটা বলেই সুমেশের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে রান্নাঘরের দিকে নিয়ে গেলেন সুমিতা দেবী।

"আমাদের পিছনের দিক দিয়ে যেতে হবে। রান্নাঘরের ডানদিকে একটা দরজা আছে। ওটা দিয়ে পিছনের বাগানে যেতে হয়। আসুন।"

* * * * * * * * * * *

"আপনি?"

সুমিতা দেবীর টর্চের আলো যার মুখে পড়েছে, তাকে দেখে সবার প্রথম

এই কথাটাই বেরিয়ে এল সুমেশের মুখ থেকে। এই মুহূর্তে ওরা দাঁড়িয়ে রয়েছে মল্লিক বাড়িরই পিছনের দিকের বাগানে। আগেই বলেছি, এই এলাকার বেশির ভাগ বাড়িতেই গাছপালার আধিক্য রয়েছে। এই বাড়িও তার অন্যথা নয়। আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আমলকী, নারকেল, দারুচিনি ছাড়াও মেহগনি, নিমসহ আরও নানান গাছগাছালি। বাড়ির এইদিকে এর আগে কখনও আসেনি সুমেশ। প্রয়োজনই পড়েনি। আজ এখানে এসে বুঝতে পারল, একটা সোঁদা বনজ গন্ধ রয়েছে চারদিকে।

সুমিতা দেবীকে অনুসরণ করে রাতের আঁধারে এই বাগানে এসে দাঁড়াতেই তার বুকটা কেমন যেন ছ্যাঁতছ্যাঁত করে উঠেছিল প্রথমে। কিন্তু আচমকাই অন্ধকারের বুক ফুঁড়ে একটা একটা শরীর তার সামনে প্রকট হতেই চমকে উঠেছিল সুমেশ। সুমেশ চেয়েছে, এইসবের নিষ্পত্তি ঘটুক। মড়ির নিষ্পত্তি ঘটুক। তার জন্য যে বিপদে তার সঙ্গে বাকি সকলেও পড়েছে, সেটা কেটে যাক। তার জন্য তার যা করা প্রয়োজন, সে তা-ই করবে। এই পাড়ার কেউ যদি তার সঙ্গে কথা বলত, তাহলে সে তাদেরকে তার এই মনের ইচ্ছেটা জানাত। কিন্তু সকলেই যখন তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন বাধ্য হয়ে এই কথাটা সে সুমিতা দেবীকে জানায়। তার কথা শুনে কিছুক্ষণ তার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন সুমিতা দেবী। কিছু পরে এসে সুমিতা দেবী তাকে জানান রাত্রি বারোটার পর তৈরি থাকতে। কেউ একজন তার সঙ্গে দেখা করবে। সেই নির্দেশ মেনেই এই রাতের আঁধারে সেই ব্যক্তির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে সুমেশ। সে আন্দাজ করেছিল, পরিচিত কেউ হবে, কিন্তু এই ভদ্রলোককে সে আশা করেনি। তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই কম চুলওয়ালা ভদ্রলোক, যাকে প্রথম অমুয়াদের কথা বলবার পর থেকেই বীথি আর সুমেশের জীবনে নেমে এসেছে বিপত্তি। সেদিনের পর থেকে এই লোকটিই যেন দায়িত্ব নিয়ে শত্রুতা করে চলেছে সুমেশের সঙ্গে। এই সেই লোক, যে সেদিন মড়া পোড়ানোতে আপত্তি তুলেছিল। এই সেই লোক, যার নির্দেশে এলাকার লোকজন তাকে একঘরে করে রেখেছে। এই লোক এখানে কী করছে? লোকটাকে দেখেই প্রচণ্ড রাগে সুমেশের শরীর রি রি করে উঠল

সুমেশের।

"চিনতে পেরেছেন তাহলে? আমার নাম সনাতন বাউড়ি।"

"আপনাকে চিনতে পারব না! আপনিই তো সেই ব্যক্তি... যিনি শত্রুতা করবার জন্য হাত ধুয়ে আমার পিছনে পড়ে রয়েছেন।"

লোকটি হাসল, "হ্যাঁ, আপনি সেটা বলতেই পারেন। তবে আমিও বলতে পারি, আপনিই সেই ব্যক্তি, যিনি দায়িত্ব নিয়ে আমাদের সর্বনাশ করেছেন। কী, করেছেন তো?"

কথাটা বলামাত্রই চুপ করে গেল সুমেশ। ভেতরে ভেতরেই কেমন যেন কুঁকড়ে গেল সে।

"যাক গে। পুরোনো কথা ওঠালে অনেক কিছুই ওঠাতে হয়, তাই সেসব বাদ দিন।" বয়স্ক ভদ্রলোক একটু থেমে সরাসরি তাকাল সুমেশের দিকে, "শুনলাম, আপনি নাকি মড়ির এই তাণ্ডবের শেষ করতে চাইছেন?"

"আমি চেয়েছি। এসব যাতে শেষ হয়ে যাক। এর জন্য যা করতে হয়, আমি তা-ই করতে রাজি আছি।"

ভদ্রলোক সুমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত।

"মড়িকে শেষ করতে গেলে, আগে মড়ির ব্যাপারে জানতে হবে বিশদে। মড়ি কে। মড়ির উৎপত্তি কোথায়। এসব না জানলে তো আপনি কিছু বুঝতেই পারবেন না। আর সত্যি বলতে এই ব্যাপারে আমার জ্ঞান নেই। এসব জানতে গেলে অমুয়াদের কাছে যেতে হবে আপনাকে।"

"কাদের কাছে? অমুয়াদের কাছে?" সুমেশ অবাক, "এ কথা আপনি বলছেন? আপনিই না ওদের সঙ্গে দেখা হওয়া নিয়ে এত সিন ক্রিয়েট করলেন সেদিন? আজ আপনিই বলছেন..."

"অমুয়ারা নিজেরাই চায়, লোকেরা ওদের থেকে দূরে থাকুক। তাই নিজেদের সম্পর্কে এই ধরনের কথা রটিয়ে রেখেছে, যাতে লোকেরা ওদের অপয়া ভেবে, ভয় পেয়ে, ওদের থেকে দূরে সরে যায়। কারণ ওরা বিশ্বাস

করে, মড়ির এঁটো ওদের গায়ে লেগে থাকে। আর এই এঁটো যারা ছোঁয়, তাদের সর্বনাশ হয়।"

"মানে?" বিস্ময়ে সুমেশের মুখ হাঁ হয়ে গেল।

"অমুয়া কারা জানেন? অমুয়ারা আসলে হল মড়ির ডোম। মড়ির এই দেহমুক্তির আগে মড়ির ডোমের কাজ ছিল, মড়ি যখন তার খাবার খেয়ে চলে যায়, তখন সেখানে ফেলে রেখে যায় কিছু উচ্ছিষ্ট। এই উচ্ছিষ্টগুলো নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে সৎকার করাই ছিল অমুয়াদের কাজ। এই পুরো কাজটাই করতে হত লোকচক্ষুর আড়ালে। সকলের অগোচরে।"

"আর অমুয়া কীভাবে তৈরি হয়?"

"শিকারি বাঘ যখন মানুষ শিকার করে, তখন সে পুরো খাবারটা একেবারে খেতে পারে না। অর্ধেক খাওয়া অংশকে ফেলে রেখে যায়। আবার পরে এসে বাকিটা খায়। সুন্দরবন অঞ্চলে এই অর্ধভুক্ত মৃতদেহকে বলা হয় মড়ি। এবার এই পিশাচিনী মড়িও বাঘের মতো দুবার তার খাবার খেতে আসে। প্রথমবার খাওয়া থেকে শুরু করে, দ্বিতীয়বার খাওয়ার আগে পর্যন্ত সেই অর্ধভুক্ত মড়াকে বলা হয় মড়ির এঁটো। এই এঁটোকে দেখতে নেই। এঁটো যদি কেউ দেখে ফ্যালে, তাহলে নাকি অর্ধভুক্ত মড়া জীবন্ত হয়ে ওঠে, তারপর তাকে-সহ তার পুরো পরিবারকে নিকেশ করে দেয়। এবার কোনওক্রমে এঁটো-দেখা এই মানুষটা যদি বেঁচে থাকে, তাহলে সেই মানুষটাই হয়ে ওঠে অমুয়া।" সনাতন বাউড়ি একটানা কথা বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কয়েক মুহূর্ত এইভাবে চুপ করে থাকার পরে বিড়বিড় করে বলল, "তোমরা সেদিন যাকে দেখেছিলে, আর সেদিন শ্মশানে যে মশাল হাতে ছুটে এসেছিল, সে হল এই গ্রামেরই রামকৃষ্ণ সরকারের ছেলে। তার বাবাকে যেদিন মড়ি খেতে এসেছিল, সেদিন সে ভুল করে মড়ির এঁটো দেখে ফ্যালে। সেদিন তার পরিবারের সঙ্গে সে-ও মারা যেত, যদি ওই বয়স্ক অমুয়াটি আজ থেকে তিরিশ বছর আগে সঠিক সময়ে না পৌঁছোত।"

(২)

জগড়বৃক্ষ

বাইক থেকে নেমে গাড়ির ইঞ্জিনটা অফ করামাত্রই হেডলাইটের হলুদ আলোটা টুক করে নিবে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে পুরো জায়গাটা গভীর অন্ধকারে ঢেকে গেল। কবজি উলটে ঘড়ির সময়টা দেখল অপরেশ। রাত্রি একটা বেজে পঁয়তাল্লিশ মিনিট। ইশ্! আজ আবার লেট। তার স্ত্রী লাবণ্য তাকে আজ সকালেই বারবার বলে দিয়েছিল তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার কথা। সেরকম প্ল্যানও করে রেখেছিল সে। কিন্তু আচমকা দুপুরের পর একটা আর্জেন্টি মিটিং সমস্ত কিছু ওলটপালট করে দেয়। মিটিং-এ জানা যায়, সরাসরি সিএম-এর দপ্তর থেকে নির্দেশ এসেছে দ্রুত পুরো ব্যাপারটাকে নিকেশ করবার জন্য। আসলে হেমতপুরের এই মাস কিলিং ইনসিডেন্টের মতো ঘটনা বহু যুগ হয়ে গেল দেখা যায়নি। অবশ্য মাস কিলিংই বা বলছি কেমন করে, মৃতের তো কোনও এভিডেন্সটুকুও পাওয়া যায়নি, শুধু ওই চুল আর রক্ত বাদ দিয়ে। ডিএনএ টেস্টে যদিও জানা যাচ্ছে, রক্ত আর চুল ভিকটিমেরই, তবু এটুকু দিয়ে তো আর কিছু হবে না। খুনের মামলা রুজু করতে গেলে অন্তত ডেডবডি পাওয়াটা জরুরি। ওদিকে ওপরতলা থেকে চাপ ক্রমশ বাড়ছে। কোনও সাইকো সিরিয়াল কিলারের কাজ হলে, দ্রুত তাকে খুঁজে বের করে, তার শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সামনেই ইলেকশন, সরকার চায় না বিরোধী দল ভোটের আগে এই নিয়ে বড় কোনও ইশ্যু তৈরি করুক।

অবশ্য সে তো নিজেই চায়, অতি দ্রুত আসামিরা ধরা পড়ুক। চারদিকে মৃত্যুর মিছিল আর মৃত্যুর খবর শুনতে শুনতে লাবণ্যও কেমন একটা দিন দিন হয়ে যাচ্ছে যেন। সব সময় ভয়ে কুঁকড়ে থাকে। তার এখনই সময় হচ্ছে না, নইলে লাবণ্যকে কয়েকদিনের জন্য বাপের বাড়িতে রেখে আসত। তা ছাড়া চারপাশটাও কেমন একটা হয়ে যাচ্ছে। পাড়ার মহিলারা এমনিতেই কুসংস্কারাচ্ছন্ন। এসব ঘটনা বেড়ে যাওয়ায় তারা মনে করছে, এসব মড়ি নামক

সেই ভয়ংকর পিশাচিনীর কাজ। তারা নাকি কী সব উপাচার করবে এসব আটকানোর জন্য। বলাই বাহুল্য, এসব জিনিস লাবণ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। নাহ্, এখানে ওকে বেশি দিন রাখা চলবে না।

পুরো পাড়াটা এই মুহূর্তে অন্ধকার। নাহ্, লোডশেডিং নয়। কয়েকদিন ধরে স্ট্রিটলাইটগুলো মায়ের ভোগে গিয়েছে। আর এখন এত রাত্রি, যে কেউ ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখবে না। অবশ্য সবাই যে ঘুমিয়ে পড়েছে তা নয়। কোনও কোনও বাড়ি থেকে এখনও ভেসে আসছে ছড়ার মিনমিনে সুর।

এই আরেক জ্বালা হয়েছে। সন্ধ্যা হলেই লোকজন ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে, এই এক ছড়া পাঠ করতে শুরু করে দেয়। ওদের বিশ্বাস, এতে করে নাকি মড়িকে আটকানো যায়। লাবণ্যও সকলের দেখে দেখে দু-দিন আগে এসব শুরু করেছিল। পরে অনেক বকাঝকা করে এগুলো বন্ধ করতে হয়েছে।

অপরেশ দেরি না করে, লাবণ্যর ফোনে ফোন লাগাল। লাবণ্যকে বলা আছে, রাতের বেলা ও যতক্ষণ না লাবণ্যকে ফোন দিয়ে দরজা খুলতে বলে, ততক্ষণ যেন ও দরজা না খোলে। কিন্তু এ কী? লাবণ্যর ফোন নেটওয়ার্ক কভারেজের বাইরে কেন?

"লাবণ্য... লাবণ্য..."

অপরেশ যে বাড়ির নীচের তলায় ভাড়া থাকে, সেই বাড়িটা দোতলা। অপরেশ লাবণ্যর নাম ডাকতে ডাকতে, সদরের গ্রিলের দরজার কাছে এগিয়ে আসতেই চমকে উঠল। এ কী! দরজা খোলা কেন?

অপরেশের কপালের ভাঁজ গাঢ় হল। সে দেরি না করে, ঝটপট এগিয়ে বাঁদিকের সুইচবোর্ডের আলোটা জ্বালাতে গিয়েই একটা খুট করে শব্দ ছড়িয়ে পড়ল, কিন্তু আলো জ্বলল না। এ কী! লোডশেডিং নাকি?

অপরেশের মনটা আচমকাই কু ডাকতে শুরু করেছে।

"লাবণ্য... লাবণ্য... সাড়া দিচ্ছ না..." কথাটা বলতে বলতেই সামনের রুমের দরজাটা ঠেলে, কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন থমকে গেল অপরেশ। এটা

ওদের বেডরুম। এতক্ষণ টের পাওয়া যাচ্ছিল না। কিন্তু এই ঘরে ঢুকতেই একটা তীব্র কাঠ-পোড়া গন্ধ তার নাকে ধাক্কা মারল। সঙ্গে সঙ্গে অপরেশের সমস্ত চেতনা যেন লীন হয়ে গেল।

আচমকা অন্ধকার ঘরের এককোণ থেকে খসখসে একটা আওয়াজ ভেসে আসতেই, অপরেশের সমস্ত স্নায়ু সচেতন হয়ে উঠল। সে দ্রুত পকেট থেকে একটা মোবাইল ফোনটা বের করে, ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা জ্বালাতেই বেড রুমের নির্দিষ্ট কোনায় ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল সাদা আলোর বৃত্তাকার বলয়।

একটা নারী শরীর, পরনে সবুজ রঙের প্রিন্টেড ম্যাক্সি। অপরেশের দিকে পিছন ঘুরে, উবু হয়ে বসে, ঘাড় ঝুঁকিয়ে কী যেন একটা করে চলছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অপরেশ লাবণ্যকে দেখেই চিনেছে। খসখসে শব্দটা লাবণ্যর কাছ থেকেই আসছে। কিন্তু ওইভাবে বসে কী করছে সে?

একটা অন্যরকম অস্বস্তিতে অপরেশের বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে।

"লাবণ্য? লাবণ্য...? ওখানে বসে কী করছ?" অপরেশের গলার স্বরে আচমকা মেয়েটির হাতের কাজ থামিয়ে সটান উঠে দাঁড়াল। মেয়েটি এখনও ঘাড়টি ঝুঁকিয়ে রেখেছে। অন্ধকার ঘরে মোবাইলের ফ্ল্যাশের আলো সরাসরি মেয়েটির পিঠের ওপরে পড়ছে।

"লাবণ্য...? লাবণ্য...? পিছন ঘুরে আছ কেন? কথা বলছ না কে..."

কথাটা শেষ করতে পারল না অপরেশ। তার আগেই সে আঁতকে উঠল প্রবল আতঙ্কে। লাবণ্য গোড়ালির ওপর চরকি পাক খেয়ে সরাসরি ঘুরে তাকিয়েছে তার দিকে... মোবাইলের ফ্ল্যাশের আলো সরাসরি মেয়েটির মুখের ওপর পড়ছে।

এ কে? লাবণ্য? নাকি অন্য কেউ? লাবণ্য হলে, এ নিজের কী অবস্থা করেছে সে?

মেয়েটার এক হাতে একটা খুর ধরা। আর সে সেই খুর নিয়ে নিজের মাথাটা কামাচ্ছিল এতক্ষণ ধরে। সেই চুল কামানোর খসখসে শব্দই এতক্ষণ পাচ্ছিল

অপরেশ। মাথার অর্ধেকটা চুল আর অর্ধেকটা কামানো অংশ খুবলে, চিরে বীভৎস হয়ে উঠেছে। শুধু কি তা-ই? কোন এক অদ্ভুত মন্ত্রবলে লাবণ্যর চোখের তারাগুলো যেন ধীরে ধীরে ঘোলাটে হয়ে গেছে।

অপরেশ ছুটে গিয়ে স্ত্রী-কে আঁকড়ে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে উঠল, "এ তুমি কী করেছ, লাবণ্য? কী করেছ? কেন করেছ?"

লাবণ্য জড়ানো কণ্ঠে কী একটা বলতেই, অপরেশ শুনতে পেল না।

"কী? কী বলছ তুমি?"

"ও... ও আমায় করতে বলেছে এসব। হিঃ হিঃ!"

"ও? কে ও?" অপরেশ চোখের জল মুছল—"এ নিশ্চয়ই এ পাড়ারই ওই মহিলাদলের কাজ।"

"হিঃ হিঃ। উঁহু... ওদের কাজ নয়। ওই যে ও..." কথাটা বলেই, লাবণ্য পিছনের আলমারির দিকে ইঙ্গিত করতেই, চমকে পিছন ঘুরল অপরেশ। তার সঙ্গে সঙ্গে ফ্ল্যাশলাইটের আলো বেডরুমে রাখা ওদের একমাত্র আলমারির মাথায় গিয়ে পড়ল। আর আলোটা সেখানে পড়তেই অপরেশ যা দেখল, তাতে করে মনে হল, এক মুহূর্তে বুকের সব রক্ত জমে হিম হয়ে গেল যেন।

আলমারির ওপর একটা মেয়ের শরীর। পায়ের পাতা আর হাতের চেটোর ওপর ভর দিয়ে উবু হয়ে বসে রয়েছে। মুখ দেখা যাচ্ছে না। কারণ একঢাল কালো চুল মুখের সামনেই পড়ে রয়েছে। সারা শরীরের কুঁকড়ে-যাওয়া চামড়া কুচকুচে কালো। মেয়েটির চোখ দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু অপরেশ স্পষ্ট বুঝতে পারছে, মেয়েটা ঘাড় হেলিয়ে তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে।

"কে? কে ও...? কে তুমি?" অপরেশ রিভলভারটা বের করার জন্য হাতটা বাড়াতেই, লাবণ্য পিছন থেকে অপরেশের গলা জড়িয়ে বলল, "মড়ি... হিঃ হিঃ..."

আর ঠিক তারপরেই, মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা টুক করে নিবে গিয়ে গোটা ঘরটা ঘুটঘুটে অন্ধকারে ভরে গেল।

* * * * * * * * * * *

"উপায়?" বৃদ্ধ লোকটি সরাসরি তাকাল সুমেশের দিকে। মশালের আলোয়, জটাজূট আর বলিরেখাঢাকা মুখটা যেন পাথরের খোদাই-করা বলে মনে হচ্ছিল সুমেশের। বৃদ্ধটি বসে রয়েছে একটা ভাঙা পাথরের দেওয়ালের ওপর। তার পিছনেই মশাল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেই বোবা লোকটা। প্রথম দিনের মতো আজও তার মুখে কালো কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা।

"নিজে সব্বনাশ করে, এখন উপায় খুঁজতে এসেছ? তুমি জানো, তুমি কী সব্বনাশ করেছ?" শেষের দিকের কথাটা বলতে গিয়ে গর্জে উঠল বৃদ্ধ লোকটি।

সুমেশের থেকে কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে সনাতন বাউড়ি আর সুমিতা দেবী। বৃদ্ধের অকস্মাৎ রেগে যাওয়ায়, সনাতন বাউড়ি এগিয়ে আসছিল কিছু বলতে। তাকে ইশারায় থামিয়ে, খুব শান্ত স্বরে সুমেশ বলে উঠল, "আমি জানি, আমি কী ভুল করেছি। মানুষমাত্রই ভুল করে। কিন্তু মানুষ ওই ভুল থেকেই শেখে। আমিও শিখেছি। শিখছি। অতীতে যা করে ফেলেছি, তা বদলানো যাবে না। তাই সে নিয়ে আলোচনা করে সময় নষ্ট করবার কোনও মানে হয় না। আমি চাই মড়িকে আটকাতে। এই তাণ্ডবলীলা বন্ধ করতে। মড়ির বিনাশ হোক, সেরকম কি কোনও উপায় আছে?"

বৃদ্ধ লোকটি কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে সুমেশের মুখের দিকে তাকালেন। "মড়ির এখন আর কোনও বিনাশ নেই। মড়ি ততদিন পর্যন্ত আয়ত্তে ছিল, যতদিন পর্যন্ত ও দেহবন্ধনে যুক্ত ছিল। ঠিক যেদিন ও বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছে... সেদিন থেকে ও অপরাজেয় হয়েছে।"

"কোনও কিছুই অপরাজেয় হয় না, বাবা। সব কিছুরই বিনাশ হয়। সব কিছুরই দুর্বলতা রয়েছে। আমাদের শুধু সেই সঠিক দুর্বলতাটা জানতে হয়।" সুমেশের কণ্ঠ স্থির।

"হ্যাঁ, কিন্তু সেই দুর্বলতার হদিস কোথায় গেলে পাব... কে দেবে সেই হদিস... কে রয়েছে? কোন মানুষ..." কথাটা বলতে বলতেই মাঝপথে আচমকা থমকে গেলেন সেই বয়স্ক অমুয়া। কিছু একটা ভাবছেন একমনে...

কয়েক মুহূর্ত স্থির হয়ে বসবার পর আচমকা তিনি টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর পিছন ঘুরে সেই বোবা লোকটিকে বলে উঠলেন, "বিলু রে... উপায় তো পেতেই হবে। ভয়ংকরীর খিদে অনেক। ও থামবে না। উপায় না বের করলে সব্বনাশ হয়ে যাবে।"

"অয়াওয়া...আআআআ...ও..." বোবা লোকটি আবার গোঙিয়ে উঠল। সুমেশ বা অন্যরা সেই কথা না বুঝতে পারলেও বৃদ্ধ লোকটি ঠিক বুঝতে পারল বোবা লোকটির কথা। "আউধুনির ডাঙায় যেতে হবে রে... আউধুনির ডাঙায়... সেখানে গেলেই ও মাগি শায়েস্তা। ওখানে গেলেই জানা যাবে সে মাগিকে জব্দ করবার উপায়। এই... এই... এসো তোমরা। এসো..."

* * * * * * * * * *

এই প্রথম কোনও জায়গায় দাঁড়িয়ে সুমেশের বুকটা অজানা অস্বস্তিতে দমে এল যেন। নির্দিষ্ট কোনও জায়গা যে এত ভয়ংকর হতে পারে, তা তার জানা ছিল না। সারি সারি গাছ দিয়ে ঘেরা আবদ্ধ এই জায়গার দাঁড়ালেই বুকটা ছ্যাঁত করে ওঠে।

অন্ধকারভরা এই বধ্যভূমির মাঝে জেগে রয়েছে কিছু ডালপালাবিহীন, খুঁটির মতো কিছু বিরাট বিরাট গাছ। সেই গাছগুলোও আবার বড় বড় লাল কাপড় দিয়ে প্যাঁচানো। মশালের আলোর বিস্তার বেশি দূর না। সেই আলো-অন্ধকারে বেশি দূর চোখ চলে না, তারপরেও সুমেশ অবাক হয়ে দেখল, গাছগুলোর মাথা থেকে দড়ি-বাঁধা অবস্থায় কিছু একটা ঝুলছে। পুঁটুলির মতো।

"এই জিনিস আমি এর আগে কোথাও দেখেছি একটা..."

সুমেশ এই কাপড়-মোড়া ডালপালা নিখুঁত করে ছাঁটা গাছ এর আগে কোথায় যেন দেখেছে। কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছে না কোথায় দেখেছে।

"এইগুলো হল জগড়বৃক্ষ। হেমতপুরের কিছু বাড়ির বাগানে এই ধরনের এক গাছ দেখতে পাবে। দেহবন্ধনে যুক্ত থাকা মড়ি এই গাছকে ভয় পায়। তারই প্রতিকৃতিস্বরূপ, হেমতপুরের যে যে বাড়িতে মড়ি হানা দিয়েছে, সেই সেই বাড়িতে এই ধরনের একটি গাছ বানানো হয়। যাতে সেই বাড়িতে মড়ি দ্বিতীয়বার না আসে।"

বয়স্ক অমুয়া কথাটা বলে উঠতেই সনাতন বাউড়ি অবাক গলায় প্রশ্ন করল, "বানানো হয়? কে বানায়? আমি তো জানতাম, গাছগুলো এমনভাবেই তৈরি হয়।"

বয়স্ক লোকটি সনাতনবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "আমরা বানাই। প্রয়োজনে। আর সেই বানানোটা হয় একটা বিশেষ উপাচারে।"

"আপনি বললেন, দেহবন্ধনে যুক্ত থাকা মড়ি এই গাছকে ভয় পায়। কিন্তু কেন?"

সুমেশের প্রশ্ন শুনে বৃদ্ধটি মুচকি হাসলেন, তারপর বিড়বিড় করে বলে উঠলেন, "এসো আমার সঙ্গে..." কথাটা বলেই তিনি মশাল হাতে সামনে এগিয়ে গেলেন। আর তাঁর পিছন পিছন বাকি সকলে।

"ওই যে পুঁটুলিগুলো দেখতে পাচ্ছ। ওই যে... গাছেদের ওপরের অংশ থেকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। ওগুলোকে মড়ি ভয় পায়। কেন জানো? ওগুলোতে রয়েছে সেইসব হাড়গোড়। মড়ি খেয়ে চলে যাওয়ার পর যেগুলো উচ্ছিষ্ট হয়ে পড়ে থাকত। আর যেগুলো সৎকারের দায়িত্ব থাকত আমার..."

ঠিক এমন সময়, পিছন থেকে বোবা লোকটি আবার গোঙিয়ে উঠতেই বয়স্ক লোকটি বিরক্ত হয়ে বলে উঠল, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছি। দাঁড়া। কিন্তু এখানে

কোনও রকমের মড়ির এঁটো আনা যায় না। এই যে উচ্ছিষ্টগুলো রয়েছে, এগুলো বিশেষ উপায়ে শুদ্ধ করে তারপর এখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।”

“কেন? এখানে এঁটো আনা যায় না কেন?” সুমেশ প্রশ্নটা করতেই, থমকে দাঁড়াল সেই বয়স্ক ভদ্রলোক। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে গাছেদের অন্ধকার মাথাগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, “একটা শুভশক্তির বিপরীতে যেমন একটা অশুভশক্তি থাকে। ঠিক তেমনই একটা অশুভশক্তির বিপরীতে এক বা একাধিক অশুভশক্তি থাকতে পারে। এই জায়গা সেরকমই কোনও এক বিপরীত অপশক্তি পাহারা দিচ্ছে। এই জায়গাটায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে এক অদ্ভুত ধরনের অস্বস্তি হচ্ছে, এ সেই অপশক্তির জন্যই। এমনিতে এরা কিছুই করে না। কিন্তু এখানে মড়ির কোনও রকমের এঁটো আনলে, এই অপশক্তির খিদে চাগাড় দিয়ে ওঠে। তখন এরা মানুষের বলি নেয়।”

“মড়ি নিজের খাওয়া হাড়গোড়গুলোকে ভয় পায় কেন?”

সুমেশ প্রশ্নটা করতেই বৃদ্ধটি হেসে বলল, “জানবে, সব জানবে... তার আগে জগড়বৃক্ষের ওপর থেকে ওই পুঁটুলিগুলো পেড়ে আনতে হবে। দেহহীন মড়িকে প্রতিহত করতে পারে সেই জিনিস, যা এতদিন দেহবন্ধনে যুক্ত থাকা মড়িকে প্রতিহত করত। কিন্তু একটু অন্যভাবে। মড়ির দেহমুক্তি ঘটবার পর থেকে সেই জিনিস শক্তিহীন হয়ে গিয়েছে। তার শক্তি আবার ফেরাতে হবে।”

“সেই জিনিস?” সুমিতা দেবী এতক্ষণ পরে মুখ খুললেন, “কী সেই জিনিস?”

“খোদ মড়ি।”

“মানে?”

“মানেটা পরে বুঝিয়ে বলছি। আগে গাছেদের মাথা থেকে ওগুলো ঝটপট নামিয়ে আনতে হবে। দেহবন্ধনে যুক্ত থাকার পরেও সেই ভয়ংকরীর ক্ষমতা অনেক ছিল। এই বিপরীত অপশক্তিসহ পুরো আউধুনির ডাঙাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল সে। দেহহীন হওয়ার পর যদি সে এই তল্লাটের সন্ধান

পায় তাহলে সব কিছু ছারখার করে দেবে। তখন তাকে আটকানোর সাধ্যি কারও থাকবে না।”

“তল্লাটের সন্ধান পায় মানে?” সুমেশ অবাক স্বরে প্রশ্ন করল, “একবার যে সন্ধান পেয়েছে, সে তো সহজেই এখানে আসতে পারবে। নতুন করে সন্ধান পাওয়ার কী আছে?”

“আছে। কারণ আউধুনির ডাঙা সব সময় এক জায়গায় থাকে না। সময়ে সময়ে আউধুনির ডাঙা নিজের স্থান পরিবর্তন করে। তখন সেই ডাঙা খুঁজে বের করতে হয় অনেক গণনা করে। আর এই গণনা শুধু অমুয়ারাই করতে পারে... তাই তো আমাদের এই ডাঙায় পা রাখতে হয় অনেক সাবধানে... একবার যদি মড়ি...”

কথাটা শেষ হল না, তার আগেই মাথার ওপরটা কেমন যেন আলো-আলো হয়ে গেল। আর ঠিক তার পরপরই পায়ের নীচে মাটির ভেতরে একটা অদ্ভুত কম্পন টের পাওয়া গেল। ঠিক যেন ভূমিকম্প হওয়ার আগের অবস্থা...

“নাহ্...”

একটা ভয়ংকর আর্তনাদ বেরিয়ে এল বয়স্ক অমুয়ার গলা চিরে। সুমেশ মাথা তুলে দেখল, জগড়বৃক্ষের মাথা থেকে ঝুলতে-থাকা সেই পুঁটুলিগুলো দাউদাউ করে আগুনে জ্বলছে। সেই পুঁটুলি, যার মধ্যে মড়ির উচ্ছিষ্ট হাড়গোড় ছিল। সেই পুঁটুলি, যা দিয়ে দেহহীন মড়িকে প্রতিহত করা যেত। সেগুলো দাউদাউ করে জ্বলছে। একটা নয়, দুটো নয়, সব ক-টা... একসঙ্গে। এক ভয়ংকর অগ্নি বিভীষিকা শুরু হয়েছে মাথার ওপরে। দেখতে দেখতেই পুঁটুলিগুলো থেকে আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল গাছগুলোর গায়ে বাঁধা লাল কাপড়গুলোতে। মুহূর্তেই জায়গাটা যেন জতুগৃহ হয়ে উঠল।

আর ঠিক তখনই, পুরো জায়গাটা জুড়ে শোনা গেল বহু কণ্ঠের সম্মিলিত কান্নার শব্দ। সে শব্দের তীব্রতা এতই বেশি ছিল, সুমেশের মনে হল, তার কানের পর্দা যেন ফেটে যাবে। ওদিকে আগুনে পুড়ে দড়িগুলো দুর্বল হতেই, ওপর থেকে সেই জ্বলন্ত পুঁটুলিগুলো খসে পড়তে লাগল।

চিৎকার করে উঠল সনাতন বাউড়ি, "পালাও... পালাও... সব পালাও..."

চোখের নিমেষে জায়গাটা যা হয়ে উঠল, তাতে সকলেরই যেন বোধশক্তি লোপ পেয়েছিল। সনাতনবাবুর কণ্ঠে সকলেরই যেন চমক ভাঙল। হ্যাঁ, পালাতে হবে, পালাতে হবে, নইলে জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে যেতে হবে। ওরা সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে সেই শিকড়ের ফাঁকের দিকে এগোতে লাগল, যেটা দিয়ে ওরা এই বধ্যভূমিতে প্রবেশ করেছিল। চারদিকে জ্বলতে-থাকা আগুনের বলয়ের মধ্যে দিয়ে ওরা ছুটে এগোচ্ছে।

পিছন থেকে বয়স্ক অমুয়া চিৎকার করছে, "মড়ি টের পেয়েছে, মড়ি টের পেয়েছে... তাই ওই ভয়ংকরী সব শেষ করে দিচ্ছে। ও-ই সব আগুন ধরাচ্ছে...।"

আর ঠিক তখনই একটা তীব্র মেয়েলি কণ্ঠের চিৎকার। সুমেশ স্পষ্ট দেখল, ওপর থেকে একটা জ্বলন্ত কাপড়ের পুঁটুলি খসে সুমিতা দেবীর মাথায় পড়তেই, তাঁর সারা গায়ে দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল।

একটুও সময় পেল না সুমেশ। ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে হাত বাড়িয়ে রইল শুধু। হাজার কান্নার শব্দের মাঝে হারিয়ে গেল জ্বলতে-থাকা সুমিতা দেবীর মরণ আর্তনাদ।

কিন্তু এখানে তো এইভাবে পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। সেই বোবা অমুয়া, সুমেশের হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা টান মেরে আবার ছুটতে লাগল সামনের দিকে। পালাতে হবে। বাঁচতে হলে এই অগ্নিকুণ্ড থেকে পালাতে হবে। ওদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সেই সমবেত মরণ কান্নার আওয়াজ।

সুমেশ দেখল, সেই শিকড়ের ফাঁকের কাছে সবার আগে পৌঁছোল সনাতন বাউড়ি। সে খুব দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে শরীরটাকে গলিয়ে দিল শিকড়ের ফাঁক দিয়ে।

"আ...আআ...আআআ..."

সুমেশ বুঝতে পারল না বোবা লোকটি কী বলতে চাইছে। সে শুধু এটুকু বুঝল, সে তাকে মরিয়া হয়ে শিকড়ের ফাঁক দিয়ে পার হয়ে যেতে বলছে। সুমেশ আর দেরি না করে শিকড়ের ফাঁকে মাথাটা গলিয়ে দিতেই, উলটোদিক থেকে সনাতন বাউড়ি একটা হ্যাঁচকা টান মারল। সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গে পুরো শরীরটা বাইরে বেরিয়ে এল।

ওর পরে পরেই বেরিয়ে এল বোবা লোকটা, সে বেরিয়েই শিকড়ের ফাঁকে মুখ রেখে গোঙিয়ে উঠল, "আ...ওওও...আআ..."

সুমেশ বুঝতে পারল, ও সেই বুড়ো লোকটিকে তাড়াতাড়ি আসতে বলছে।

"ওওও...অ..."

বুড়ো প্রায় এসে পড়েছে কাছে। বোবা লোকটি বুড়োকে ধরবার জন্য নিজের হাতটা শেকড়ের ফাঁক দিয়ে বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক তখনই আচমকা একটা হোঁচট। বুড়টা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে খসে পড়ল একটা কাপড়ের পুঁটুলি। ঠিক তার শরীরের ওপর... সুমেশ শিকড়ের ফাঁক থেকে দেখল, মুহূর্তেই দাউদাউ করে জ্বলে উঠল সেই দেহ।

আর সেই দৃশ্য দেখে সহসা বোবা লোকটির গলা চিরে বেরিয়ে এল একটা ভীষণ চিৎকার। কিন্তু সেই চিৎকারে ছিল না কোনও গোঙানি। বদলে ছিল একটি শব্দ...

"গুরুদেব...!"

ঠিক তিরিশ বছর আগের একটি দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটল। এই আউধুনির ডাঙাতেই। শুধু একটু অন্যভাবে।

(৩)

মড়ির হাড়

“সাবধানে...”

কথাটা বলেই সুমেশের কনুইটা আঁকড়ে ধরল লোকটি। সকালের দিকে হালকা বৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। জঙ্গলের ভেতরে গাছের মোটা মোটা শিকড় তাই পিছল হয়ে রয়েছে। তারই একটিতে পিছলে প্রায় পড়বার উপক্রম হয়েছিল সুমেশের। কোনওমতে তাকে আটকে দিল সেই বোবা লোকটি। যদিও এখন লোকটি আর বোবা নেই...। কালকের সেই আকস্মিক দুর্ঘটনায় তার গলার আওয়াজ ফিরে এসেছে।

কালকে চোখের সামনে নিজের পিতৃসম গুরুদেবকে ওইভাবে পুড়তে দেখে নিজের বোধ হারিয়ে ফেলেছিল লোকটি। কোনওভাবে তাকে ভাঙা মন্দিরে ফেরত এনেছিল সনাতন বাউড়ি আর সুমেশ। সুমেশের নিজেরও ভেতরটা সুমিতা দেবীর মৃত্যুতে যথেষ্ট কাতর ছিল। কিন্তু তবুও নিজেকে সামলাতে পেরেছিল সে। সুমিতা দেবীকে চোখের সামনে দেখলেও, তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতা এত ছিল না। কিন্তু সকালে যখন সে শুনতে পেল, গতকাল রাতে অপরেশবাবু আর তাঁর স্ত্রী-র চুল পাওয়া গিয়েছে তাঁদের বাড়িতে, তখন সুমেশের ভেতরে যেটুকু আশা ছিল, সেটুকুও যেন নিবে গেল।

সে কীভাবে আটকাবে মড়িকে? তার তো কোনও উপায় জানা নেই। বুড়ো অমুয়া, মড়ির ফেলে-যাওয়া হাড়গোড় থেকে কিছু একটা পন্থা খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই পন্থা কী ছিল, সেটা বোঝার আগেই সমস্ত কিছু ছারখার হয়ে যায়। বুড়োর কথামতো মড়িই নাকি সব কিছু ধ্বংস করেছে। কিন্তু কীভাবে? তারমানে মড়ি কী সুমেশের পিছু নিয়েছিল? না হলে আউধুনির ডাঙায় পৌঁছোনো তো সহজ ছিল না তার পক্ষে? তার মানে কি মড়ি এটা জেনে গিয়েছে যে, সুমেশ তাকে শেষ করবার কথা ভাবছে? কিন্তু তা-ই যদি জেনে গিয়ে থাকে, তাহলে সে সুমেশকে শেষ করছে না কেন?

নাকি... নাকি মড়ি তাকে বাঁচিয়ে রেখে এটা দেখতে চায়, সে কোন পদ্ধতিতে ওই ভয়ংকরীকে শেষ করতে চায়? এটা কি এক ধরনের যুদ্ধ ছুড়ে দেওয়া? নাকি এক সামান্য শক্তিহীন মানুষের প্রতি এক ভয়ংকরী ক্ষমতাশালী পিশাচিনীর অবজ্ঞা? যা-ই হয়ে থাক, তার এখন আর পিছু হটার অবকাশ নেই।

কিন্তু অমুয়াদের সাহায্য ছাড়া সে যখন কিছুই করতে পারবে না বলে ভাবছিল, ঠিক তখনই সন্ধ্যার মুখে, অন্ধকার গায়ে মেখে, এই অমুয়াটি হাজির হয় মল্লিক বাড়িতে। কথায় কথায় জানা যায়, এই লোকের নাম বিলু। ভালো কিছু একটা নাম ছিল। কিন্তু দীর্ঘদিনের অব্যবহারে সে নাম কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছে।

"আপনাকে একটু আমার সঙ্গে আসতে হবে।"

"কোথায়?"

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে সরাসরি প্রশ্ন করেছিল সুমেশ। উত্তরে লোকটি কিছু না বলে, সঙ্গে সঙ্গে নিজের গলায় পরিহিত একটা লাল সুতোর কাঠের পুঁতির মালার বাড়তি অংশ সুমেশের মাথায় গলিয়ে দিল। আর তারপরেই বিড়বিড় করে বলে উঠল, "খেমি মায়ের মালা এটা। এই মালা পরলে, আমাদের কথা মড়ির কান পর্যন্ত পৌঁছোবে না। আমি জানি, সে এখন আপনার চারদিকে ওঁত পেতে রয়েছে, হয় শরীরে, না হয় অশরীরে... এবার যে কথা বলছি, সেটা মন দিয়ে শুনুন... এই মালা আমি আপনার গলায় খুলে রেখে যাব। আপনি এই মালা পরে ঠিক এগারোটা নাগাদ মন্দিরে চলে আসবেন। পরনের অশৌচের পোশাক এই সাদা থান পরেই আসবেন, অসুবিধে নেই। তবে হ্যাঁ, মালাটা অবশ্যই পরবেন। এটা পরে এলে, মড়ি আপনার পিছু নিতে পারবে না।"

"কিন্তু কোথায় যাব?"

"সেটা গেলেই জানতে পারবেন..."

লোকটির নির্দেশ মেনেই সুমেশ সঠিক জায়গায় সঠিক সময়ে উপস্থিত

হয়েছে। সেই তারপর থেকে যে ওরা হাঁটা শুরু করেছে জঙ্গলের পথে, মিনিট পনেরো হয়ে গেল, ওদের পথ আর শেষ হচ্ছে না। এদিকে জঙ্গলটা একটু ঘন। পশ্চিমদিকের মতো অতটা নয়। কিন্তু ঘন।

"পৌঁছে গিয়েছি।" এতক্ষণে সাবধানে পথ হাঁটছিল সুমেশ। আচমকাই লোকটির কথা শুনে চমকে ঘাড় তুলে দেখতেই আরেক প্রস্থ অবাক হওয়ার পালা। এ কী? এ তো সেই ভাঙা মন্দিরের কাছেই আবার হাজির হয়েছে তারা।

"এ কী! আমরা ঘুরেফিরে সেই জায়গাতেই তো চলে এলাম। আমরা কি এতক্ষণ একই জায়গায় ঘুরছিলাম?"

"কালকে গুরুদেব একটা কথা বলেছিলেন, মনে আছে? আউধুনির ডাঙা নাকি তার জায়গা পরিবর্তন করে। সাধারণ কোনও জঙ্গলে এমন কিছু শুনেছেন? এ জঙ্গল সাধারণ দেখতে হলেও এই জঙ্গল সাধারণ কোনও জঙ্গল নয়। এখানকার অনেক কিছুই তার জায়গা পরিবর্তন করে। আপনি নতুন মানুষ, তাই বোঝেননি। একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারতেন, আমরা একই জায়গায় তিনবার ঘুরেছি। তবে একটা নির্দিষ্ট পথে। এই জায়গা দেখতে এক হলেও, আদপে এক নয়। এবার আসুন..."

লোকটা কী সব কথা বলল, যা সুমেশের মাথার ওপর দিয়ে গেল। এক দেখতে জায়গা। এক নয়। মানে একই রকম জায়গা এই জঙ্গলে দুটো আছে। নাকি সবটাই মায়া?

"মড়ির এঁটো দেখা যেমন আমাদের জন্য অভিশাপ। একই সঙ্গে আশীর্বাদও। আমাদের মধ্যে আপনা থেকেই কিছু অলৌকিক ক্ষমতা চলে আসে তারপর থেকে, যার সাহায্যে আমরা এমন কিছুই করতে পারি, যা সাধারণ মানুষরা করতে পারে না।" কথাটা বলেই একটা পর্দা-টাঙানো ঘরের সামনে হাজির হল ওরা দুজন। এই ঘরটি দেখতে হুবহু সেই ভাঙা মন্দিরের পিছনদিকের সারি-দেওয়া জীর্ণ ঘরগুলোর মতোই।

একটু থেমে বিড়বিড় করে বলে উঠল, "গুরুদেব বেঁচে থাকলে, এঁর কাছে

আসার দরকার পড়ত না। এঁর কাছে বাধ্য হয়েই আসা। ভিতরে যিনি রয়েছেন, তিনি আমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন আশা করি। তবে সাবধান করে দিই, এই মানুষের কিন্তু পেটের গোপন কথা বের করানোর ক্ষমতা আছে।" কথাটা বলেই ময়লা কাপড়ের পর্দা ঠেলে ঘরের ভেতরে ঢুকে গেল লোকটি। তার পিছন পিছন সুমেশ।

ঘরের ভেতরটা অন্ধকার ঠিক নয়। আবার আলোও ঠিক নয়। এককোণে একটা প্রদীপের আলো জ্বলছে। সেই আলোর হলদেটে আভাই ঘরের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ইট আর সুরকির গাঁথনি-দেওয়া ঘরের দেওয়ালে জায়গায় জায়গায় শ্যাওলা জন্মেছে। চারদিকে কেমন যেন একটা স্যাঁতসেঁতে ব্যাপার। ঘরের মধ্যে আসবাব তেমন একটা নেই। কেবলমাত্র একটা চৌকি। সেই চৌকির ওপর দুজন মানুষ। একজন বসে, একজন শুয়ে। যে শুয়ে আছে, অন্ধকারে তার মুখ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু যে বসে আছে, তাকে দেখামাত্রই চিনতে পারল সুমেশ। আরেহ্! এ তো সেই পাগলটি, যাকে প্রথম দিন এসেই পিছনদিকের বাগানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল বীথি। "এ এখানে কী করছে?"

"এই যে লোকটি, যাকে পাগল মনে করে সকলে, সে কিন্তু একসময় খুব ভালো একজন গুনিন ছিল। অনেক বছর আগেও মড়ি একবার চেষ্টা করেছিল দেহহীন হওয়ার। তখন এই মানুষটি নিজের সর্বশক্তি দিয়ে মড়িকে আটকায়। কিন্তু প্রত্যেকটি ক্রিয়ার একটা বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। সেদিন সেই আটকানোর প্রক্রিয়ার সামান্য কিছু ভুলের জন্য লোকটির মানসিক স্থিতি চিরকালের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। তারপর থেকে ও এখানেই থাকে...। মাঝে মাঝে ও লোকালয়ে যায় বটে, যখন কারও মরবার সময় উপস্থিত হয়।"

"কে...? কে এলি...?" চৌকির ওপর শুয়ে-থাকা মানুষটার কাছ থেকে কাঁপা-কাঁপা মেয়েলি কণ্ঠস্বর ভেসে আসতেই চমকে উঠল সুমেশ।

"আমি অমুয়া।"

"কোন অমুয়া? বড় না ছোট?"

"ছোট।"

"বড় কই?" কয়েক মুহূর্তের নীরবতা নেমে এল পুরো ঘর জুড়ে।

"মারা গেছে কাল। মড়ি মেরেছে।"

"মড়ি?"

সুমেশ দেখল, মড়ির নাম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দেহটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল চৌকির ওপর। আর ঠিক তখনই কুপির আলোটা সেই বৃদ্ধার মুখে এসে পড়ল। সে মুখের দিকে তাকিয়ে, কয়েক মুহূর্তের জন্য সুমেশের সারা শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল।

যিনি উঠে বসেছেন, এই আলো-আঁধারিতে স্পষ্ট বোঝা না গেলেও, আন্দাজ করা গেল যে তিনি একজন বৃদ্ধা। বৃদ্ধার সারা শরীর জুড়ে ছোট ছোট আব। সেরকমভাবে দেখতে গেলে শরীরের কোনও অংশই বাকি নেই, এই জিনিস হতে। মাথার চুলে জট পড়ে সেটা একদিকে ঝুলছে। হাত-পায়ের নখ এত বড় হয়েছে যে, সেগুলো চরকির মতো বেঁকে গিয়েছে।

"হ্যাঁ, মড়ি। মড়ি দেহহীন হয়ে গিয়েছে।"

"কী বললি? মড়ি দেহহীন? কী করে হল?" বুড়ির গলার স্বরটা আচমকাই কেমন যেন খনখনে হয়ে উঠল।

"এই যে ইনি। ইনি কিছুদিন হল এখানে এসেছেন। ইনিই মড়িক্ষণের মড়াকে বুঝতে না পেরে জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই..."

সুমেশ দেখল, বিলু তার দিকে ইঙ্গিত করবার পরপরই পাগলটা বুড়ির কানে কানে কী যেন বলল।

বুড়ির কণ্ঠে তাচ্ছিল্যের হাসি—"বুঝতে না পেরে। নাকি জেনে-বুঝেই...। যা-ই হোক, এখানে কেন এসেছিস তোরা? কী চাই তোদের এখানে?"

"আমি মড়িকে শেষ করতে চাই। আমি চাই, যাতে করে ওর তাণ্ডব শেষ হয়। পুরো এলাকা ওর তাণ্ডবে শেষ হয়ে যাচ্ছে।"

সুমেশ মরিয়া হয়ে চিৎকার করে উঠতেই বুড়িটি আবার হেসে উঠল খিক

খিক খিক করে... যেন ভারী মজা পেয়েছে।

"মড়িকে শেষ করতে চাও? হাতি-ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল... বলি, মড়ির ব্যাপারে কতটুকু জানো?"

"মড়ি এক ভয়ংকর পিশাচিনী। সে মানুষের মড়া খেতে দুবার আসে বাঘের মতো... কৃষ্ণপক্ষের দুপুরের পর যারা মারা যায়, তাদেরই মড়ি খায়। মড়ির খাওয়া এঁটো মড়া দেখলে, সেই মড়া জ্যান্ত হয়ে যায়। আর যে দ্যাখে, তাকে আর তার পরিবারকে শেষ করতে..."

সুমেশের কথা শেষ হল না, তার আগেই খিলখিল করে বুড়িটি হেসে উঠল—

"এ তো সকলেই জানে। এ জানা দিয়ে মড়িকে শেষ করবে? পারবে?"

সুমেশের চোয়াল শক্ত হল—"পারব না বলেই তো আপনার কাছে এসেছি। আপনি আমায় সবটা জানান। আমি মড়ির তাণ্ডব শেষ করতে..."

"সব এত সোজা নয়। একটা মড়ি অন্যটাকে এতদিন বেঁধে রেখেছিল, বুঝলে...। এবার যেই একটা দেহহীন হয়ে গিয়েছে..."

বুড়ির কথা শুনে চমকে উঠল সুমেশ। সে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "একটা মড়ি... অন্যটাকে বেঁধে রেখেছিল... মানে? আমি তো জানতাম মড়ি একটাই! এখানে...এখানে কতগুলো মড়ি রয়েছে?"

সুমেশের কথা শুনে বুড়িটি এবার রহস্যের হাসি হেসে উঠল—"তুমি জানতে, এখানে একটাই মড়ি রয়েছে? হিঃ হিঃ। এখানে একটা নয়, এখানে দু-দুটো মড়ি রয়েছে। বুঝলে... দু-দুটো... হিঃ হিঃ হিঃ!"

* * * * * * * * * *

"একজন মড়ি, যে সবসময় চাইত দেহবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে দেহহীন হতে। আর আরেকজন চাইত তাকে আটকাতে। এরা একে অপরকে বিপরীত

দিক দিয়ে বেঁধে রেখেছিল।"

বুড়ির কথা শুনে বিলুও অবাক—"আমি বুঝতে পারছি না, বুড়িমা..."

"যারা বলে, মড়ি মড়া খেতে আসে, তারা অর্ধেক জানে। হিসেবমতো কিছুই জানে না। মড়ি কখনোই মড়া খেতে আসে না। কৃষ্ণপক্ষের মধ্যাহ্নের পর কেউ মারা গেলে, আর মড়িক্ষণ শুরু হলে, সর্বনাশী মড়ির আত্মা আশ্রয় নিত সেই মৃতের দেহে। সে সেই দেহে আশ্রয় নিতে চাইত এইজন্য, যাতে সেই দেহের সৎকার হলে তার দেহমুক্তি ঘটে। কায়াহীন হলে তার শক্তি অনেকগুণ বেড়ে যেত। তাকে আর-একপেট সর্বনাশী খিদে নিয়ে অপেক্ষা করতে হত না। তাই তো সে নানারকম ফন্দিফিকির করত। কখনও আউধুনির ডাঙাকে ঘুম পাড়িয়ে দিত, যাতে জঙ্গল থেকে সংকেত শব্দ না যায়। কখনও মড়ার দেহ থেকে মড়িছাপ সরিয়ে দিত। সে চাইত যেনতেনপ্রকারেণ যাতে তার আশ্রয়-করা দেহের সৎকার ঘটুক।" একটানা কথা বলে, বুড়ি কিছুটা হাঁপিয়ে গেল যেন...

"আর যে খেতে আসে? যাকে আমরা আসলে মড়ি বলে জানতাম..."

"সে-ও মড়ি। তবে শিকারি মড়ি। সে আসলে খেতে আসত না। সে আসত, মড়ির আশ্রয়-করা মড়াকে এঁটো করতে। এঁটো মড়া, খুঁত মড়া, সৎকার করলেও দেহবন্ধন থেকে মুক্ত নয়।"

সুমেশ এখনও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না। এসব কী শুনছে সে... এ যেন বিপরীতমুখী দুটো শক্তি... আর ঠিক তখনই কয়েকদিন আগে বলা অপরেশবাবুর সেই কথাটা মনে পড়ল, যেটা তিনি তাঁর বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে এলাকার বাকিদের উদ্দেশে বলেছিলেন।

"...মড়িক্ষণে কেউ মারা গেলে তার সৎকার করতে নেই। সে নাকি মড়ি নামক এক ভয়ংকরী পিশাচিনীর ভোগ। যে খাবার না পেলে নাকি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আপনাদের সর্বনাশ করবে। আবার আপনাদেরই কথামতো সেই মড়িই কী করছে? মায়া বিস্তার করে সংকেত শব্দ বাজাতে দিচ্ছে না, আবার দেহ থেকে মড়িছাপও তুলে দিচ্ছে, যাতে করে লোকেরা কনফিউজ হয়ে দেহ

সৎকার করে ফেলে। অর্থাৎ, মড়ি মৃতদেহ, নিজেই সৎকার করতে চায়, আবার সেই মড়িই ওই মৃতদেহ না পেলে, আপনাদেরই সর্বনাশ করবে। দুটো ব্যাপারই কেমন বিপরীতমুখী না?"

সুমেশের এখন নিজের হাত কামড়াতে ইচ্ছা করছে। ইশ্! তখন যদি জানত ব্যাপারটা। তাহলে আর যা-ই হোক, এত বড় ভুল সে করত না। সম্পত্তি পাওয়ার লোভে জেনে-বুঝেই আজ এই ভয়ংকর সর্বনাশ করে ফেলেছে। অবশ্য ব্যাপারটা যে এরকম, সেটাই বা তখন সে বুঝবে কী করে? তার মানে, সেই ভয়ংকরী পিশাচিনী, বুড়ির দেহ আশ্রয় করে ছিল মড়িক্ষণ পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই। তারপর ঘাপটি মেরে ওই দেহেই আশ্রয় নিয়ে বসে ছিল সৎকারের আশায়। সেদিন যদি সুমেশ বাকিদের কথা শুনে বুড়ির দেহ ছাদে রেখে আসত তাহলে উলটোদিকে থাকা মড়ি দু-দুবার এসে, সেই দেহ খেয়ে, এঁটো করে খুঁত করে চলে যেত। তাহলে আজকে মড়ি দেহহীন হয়ে এই সর্বনাশ করতে পারত না।

"এই মড়ি তৈরি হল কীভাবে? মানে, এই মড়ির তো নিশ্চয়ই তেমন কিছু ইতিহাস থাকবে তা-ই না?"

"রয়েছে তো... রয়েছে... মড়ির ইতিহাস রয়েছে। সে ইতিহাস অবশ্য আজকাল কারোরই মনে নেই। শুনবি তোরা? শুনবি?" আচমকাই বুড়ির খনখনে স্বর সরু হয়ে এল। এমনভাবে কথাগুলো ভেসে এল যেন সেই স্বর আসছে বহু যুগের ওপার থেকে—"সে আজ থেকে অনেক বছর আগে। শ-খানেক বছর আগের কথা। এই জঙ্গলের ওপারে, তখন হেমতপুরের নাম ছিল হেমন্তপুর। সেখানে তখন জমিদার দুর্লভ রায়ের জমিদারি। ভারী তার প্রতাপ। কথায় বলে, তার জমিদারিতে নাকি বাঘে-গোরুতে এক ঘাটে জল খেত। জমিদার প্রজাদরদি ছিলেন না, আবার অত্যাচারও করতেন না তাঁর প্রজাদের। মোটামুটি অবস্থাতেই সাধারণভাবে তাদের দিন কেটে যাচ্ছিল।

"ঠিক এমন সময় আচমকা ধূমকেতুর মতো জমিদারের জমিদারিতে হাজির হয় এক ফকির পরিবার। ফকির, যারা ঘুরে ঘুরে ভিক্ষা করে। বিভিন্ন

জিনিসের মাদুলি, তাবিজ, জলপোড়া, নুনপোড়া বানিয়ে টোটকা দেয়। নানান রোগের উপশম করে, এ-ও ঠিক তেমনই। সেই ফকিরের পরিবার বলতে ছিল তার বউ আর তার ছেলে। ঠিক তোমার মতো...।”

শেষের কথাটা বুড়ি সুমেশের উদ্দেশে বলতেই, সুমেশের আচমকা বীথি আর টুপাইয়ের মুখটা মনে পড়ল।

“তো, এই ফকিরও সেই তাবিজ, কবচ, মাদুলি বিক্রি করত। আর সকলকে বলত, তার এই তাবিজ-কবচের ভেতরে রয়েছে ভয়ংকর শক্তিশালী মড়ির হাড়ের টুকরো। খোদ সুন্দরবনে গিয়ে সে নাকি এই হাড় সংগ্রহ করেছে। এই হাড়ের নাকি অনেক মায়াবী ক্ষমতা। একবার মড়ির হাড়ওয়ালা তাবিজ ধারণ করলে নাকি বাত, ব্যথা, বেদনাসহ নানান শরীর খারাপ সেরে যেতে বাধ্য। সে এত বিশ্বাসের সঙ্গে কথাটা বলত যে, তার বাচনে মুগ্ধ হয়ে লোকেরা টাকা দিয়ে সেই মাদুলি, তাবিজ, কবচ সংগ্রহ করত। আসলে তার কাছে কোনও মড়ির হাড় ছিল না। ছিল সাধারণ এক শেয়ালের হাড়ের টুকরো। আর সে মাদুলির মধ্যে কোনও হাড়ের টুকরোও দিত না। সবটাই ছিল ভাঁওতা। আসলে ফকিরটি ভণ্ড ছিল। সে জায়গায় জায়গায় তার পরিবার নিয়ে ঘুরে বেড়াত। এক-এক জায়গায় কিছুদিন কাটাত, লোকেদের ভুলভাল বুঝিয়ে এইভাবে তাবিজ-কবচ বিক্রি করত। তারপর কিছু টাকাপয়সা করে সেই জায়গা থেকে সরে পড়ত। হেমতপুরে এসেও সে নিজের জালিয়াতির ব্যাবসা শুরু করেছিল। তার কথার জাদুতেই হোক কিংবা তার বিশ্বাসের জোরেই, লোকেদের ব্যথা উপশম হত। মড়ির মাদুলিতে ব্যথা উপশম হচ্ছে জেনে, লোকজন বদ্যি-কবিরাজদের ভুলে, জমা হতে লাগল এই ফকিরের আস্তানায়। দেখতে দেখতেই এখানকার সমস্ত বদ্যি-কবিরাজের পসার ফাঁকা হতেই তাদের সব আক্রোশ গিয়ে পড়ল ফকিরের ওপর। একজন বাইরের লোক তাদের এলাকায় এসে তাদের রোজগার এইভাবে শেষ করে দেবে, সেটা তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিল না। তারা জানত, ফকির ভণ্ড। তাই তাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য মনে মনে প্যাঁচ কষে, সঠিক সুযোগের

অপেক্ষা করতে লাগল। আর সেই সুযোগ এসেও গেল খুব দ্রুত।

"একদিন জমিদারের নাতি খেলতে খেলতে উঁচু জায়গা থেকে পড়ে বুকের হাড় ভেঙে যায়। প্রবল যন্ত্রণায় যখন ছেলেটি কষ্ট পেতে থাকে, তখন এলাকার বদ্যি-কবিরাজরা জমিদারকে জানায় ফকিরের ব্যাপারে। ফকিরের কাছে নাকি কী আশ্চর্য এক হাড় রয়েছে। মড়ির হাড়। যা দিয়ে সে নাকি সব ব্যথা উপশম করে দিতে পারে আশ্চর্য জনকভাবে। জমিদার প্রথমে এই কথায় বিশ্বাস না করলেও, গ্রামের কয়েকজন এই ব্যাপারে সাক্ষী দিতেই, তিনি পেয়াদাদের নির্দেশ দিলেন ফকিরকে নিয়ে আসতে। ওদিকে জঙ্গলের ভেতরে নিজের তৈরি করা আস্তানায় পাততাড়ি গোটানোর ব্যবস্থা করছিল ফকির। ঠিক এমন সময় যমদূতের মতো সেখানে জমিদারের পেয়াদাদের আগমন। মুহূর্তকাল সময় না দিয়ে প্রায় ফকিরকে উঠিয়ে নিয়ে যায় পেয়াদারা। ওদিকে জমিদারের নাতির অবস্থা বেশ সঙ্গিন। এই অবস্থাতে যখন ফকিরকে বলা হয় জমিদারের নাতির ব্যথার উপশম করতে, সে যেন তখন আকাশ থেকে পড়ে। সে কীভাবে এই ব্যথা উপশম করবে? সে তো সত্যিই কবিরাজ নয়। এর আগে লোকদের যেটুকু উপশম হয়েছে, সেটা দৈবক্রম ব্যতীত আর কিছুই নয়।

"ছোট্ট ছেলেটির অবস্থা আরও খারাপ হতে থাকে। চোখের সামনে একটা বাচ্চা ছেলেকে এইভাবে কষ্ট পেতে দেখে ভয় পেয়ে ফকির সত্যিটা স্বীকার করে ফ্যালে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যায়। বাচ্চাটি সেখানেই বেঘোরে মারা যায়। আর সত্যিটা স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে, সদ্য হারানো নাতির সমস্ত ক্ষোভ গিয়ে পড়ে ফকিরের ওপর। জমিদারের নির্দেশে পঞ্চাশ ঘা চাবুক মেরে, সারাদিন শিকল বেঁধে জনগণের সামনে ফেলে রাখা হয় তাকে। সারাদিন ধরে জনগণের চড়থাপ্পড়, মারধর চলে তার ওপর চলে। চলে শারীরিক আর মানসিক নিগ্রহ। ফকির সব কিছু মুখ বুজে মেনে নেয়, কারণ সে বুঝতে পারে, ভুল তার ছিল। দোষ সে করেছিল। তাই শাস্তি তার প্রাপ্য। সূর্য ডুবলে তাকে মুক্ত করে দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে এ-ও নির্দেশ দেওয়া

হয়, চিরকালের জন্য এই তল্লাট ছেড়ে বিদায় নিতে। ক্লান্ত, আহত শরীরে যখন ফকির ফিরে আসে জঙ্গলে নিজের আস্তানায়, তখন সেখানে যা দ্যাখে, তাতে করে তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে-মুচড়ে যায়।"

"সে দ্যাখে, তার আস্তানা কারা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সেই ভাঙা আস্তানার ভেতরে মরে পড়ে রয়েছে তার বউ আর ছেলে। দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, সমবেত প্রহারেই তাদের মৃত্যু হয়েছে। চোখের সামনে নিজের স্ত্রী আর সন্তানের এই পরিণতি দেখে প্রবল আর্তনাদে ভেঙে পড়ে ফকির। কিন্তু তা কয়েকক্ষণের জন্যই। পলকেই তার মধ্যে জন্ম নেয় প্রচণ্ড প্রতিহিংসা। সে যা অন্যায় করেছে, তার শাস্তি সে মাথা পেতে নিয়েছে। কিন্তু তার স্ত্রী আর পুত্র তো কোনও দোষ করেনি। তারপরেও এই শাস্তি কীসের জন্য...? বিনা দোষে যখন তার বউ আর সন্তান এই শাস্তি পেয়েছে, এখানকার সকলকেও সে শাস্তি দেবে।

"কৃষ্ণপক্ষের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ভূলুণ্ঠিত স্তূপ থেকে সে বের করে আনে সেই সাধারণ শেয়ালের হাড়খানি। তারপর তার একটি টুকরো ভেঙে সেটাকে বেঁধে দেয় নিজের স্ত্রী-র হাতে বাঁধা নোয়ায়। আর মনে মনে জাগিয়ে তোলে এক ভয়ংকরী অপশক্তিকে। সে ভণ্ড ছিল। তার কোনও অলৌকিক ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু সেদিন তার বুকের ভেতর থেকে বেরিয়ে-আসা দীর্ঘশ্বাস সব কিছু যেন আমূল বদলে দিল। তার মতো সাধারণ মানুষ সেদিন বিশ্বাস করেছিল, এই সাধারণ হাড়ের টুকরো, আসলেই মড়ির টুকরো। আর এই হাড় থেকেই জন্ম নেবে এক সর্বগ্রাসী ভয়ংকরী পিশাচিনী। সেদিন তার দীর্ঘশ্বাস আর প্রচণ্ড বিশ্বাসের জেরেই হোক, বা কোনও এক অলৌকিক ক্ষমতায়, দেখতেই দেখতে মাথার ওপর রাতের কালো আকাশ কমলা রং ধারণ করল। চারদিকে উঠল প্রচণ্ড হাওয়া। আর ফকিরের স্ত্রী-র শরীরে জন্ম নিল এক ভয়ংকরী মড়ি।

"মড়ি জন্ম নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই পুরো হেমন্তপুর জুড়ে শুরু হল ভয়ংকর তাণ্ডব। চারদিকে হাহাকার, মৃত্যু, রক্ত। মড়ি চোখের পলকে মানুষদের শেষ

তার আস্তানা কারা যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। শুধু তা-ই নয়, সেই ভাঙা আস্তানার ভেতরে মরে পড়ে রয়েছে তার বউ আর ছেলে।

করে দিচ্ছে। উচ্ছিষ্টটুকু হিসেবে ফেলে রাখছে মাথার চুল আর রক্ত-মেশা কাপড়। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বুড়ি, বাচ্চা—কেউ বাদ যাচ্ছে না তার তাণ্ডব থেকে। যাকে পাচ্ছে সামনে, তাকেই শেষ করছে মড়ি। ঠিক এখনকার মতো।

"এই মৃত্যুমিছিল যখন চরমে, ঠিক তখনই ফকিরের বোধোদয় হল। সে বুঝতে পারল, এ কী ভয়ংকর সর্বনাশ সে করে ফেলেছে! প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের বশে সে এমন কিছু সৃষ্টি করে ফেলেছে, যা প্রকৃতি ধ্বংস করে ফেলবে। আর তারপরেই সে মড়িকে আটকানোর কথা ভাবে। সে দেরি না করে, আবার সেই হাড়ের টুকরো তুলে নেয়। এবার নিজের মৃত ছেলের মুখের মধ্যে এক টুকরো সাধারণ হাড় রেখে বিশ্বাস করে, এই হাড় বাঘমড়ির হাড়। আবার সেই তীব্র বিশ্বাস নিজের ক্ষমতা দেখায়। সেই মুহূর্তেই সেখানে জন্ম নেয় এক বিপরীত অপশক্তি। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিরোধের প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায় মড়ির সামনে। শিকারের থেকে সব সময় শিকারির ক্ষমতা বেশি হয়। মড়ি এখানে শিকার হলে, বাঘমড়ি এখানে শিকারি। স্বভাবতই মড়ির ক্ষমতা হ্রাস প্রায়। তাণ্ডব থেকে রক্ষা পায় হেমতপুর। কিন্তু ফকির বোঝে, মড়ির মতো ধূর্ত পিশাচিনী সব সময়ই চাইবে বাঘমড়ির থেকেও বেশি ক্ষমতা পেতে... আর সেটা তখনই সম্ভব হবে, যখন তার দেহমুক্তি ঘটে সে কায়াহীন হয়ে উঠবে। তাই সে তক্কে তক্কে থাকবে এমন কোনও দেহের, যা সৎকারে যাবে।

"ফকির তখনই সিদ্ধান্ত নেয়, এরপর থেকে সে পাহারায় থাকবে হেমতপুরের। সে কোনও মূল্যেই মড়িতে পাওয়া একটি খুঁতহীন দেহের সৎকার করতে দেবে না। কালো বস্ত্র পরিধান করে সে জঙ্গলে থাকবে। আর সে-ই নিশ্চিত করবে, মড়িক্ষণ কখন শুরু হবে, যাতে করে লোকেরা মড়িক্ষণে পাওয়া মৃতদেহকে বাঘমড়ির মুখে তুলে দেয়..." একটানা এতক্ষণ কথা বলে হাঁপাচ্ছে বুড়িটা।

"তার মানে... তার মানে ফকির হল...?"

"প্রথম অমুয়া..."

এতক্ষণ পরে পাগল লোকটা কথা বলে উঠল।

"মড়ি তার মানে যতদিন দেহবন্ধনে যুক্ত ছিল, তার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল বাঘমড়ি। সে তাকে ভয় পেত। কিন্তু এখন? এই কায়াহীন মড়ি তো... বাঘমড়ির থেকেও শক্তিশালী। মড়িকে থামাতে হলে, বাঘমড়ির সমগোত্রীয় করতে হলে তো আবার মড়িকে দেহবন্ধনে যুক্ত করতে হবে। তা না করলে তো আমরা কখনোই মড়িকে হারাতে পারব না..."

সুমেশ মরিয়া হয়ে কথাটা বলে উঠতেই বুড়িটি আবার বলে উঠল, "দুধ জ্বাল দিয়ে সর তৈরি করা যায়। কিন্তু সর থেকে দুধে ফেরা যায় কি? যায় না। তাই চেষ্টা করেও লাভ নেই। তার চেয়ে বরং ভালো, সর থেকে সরপুরিয়া বানানো।"

সুমেশ বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকাল বিলুর দিকে। কী বলতে চাইছে বুড়ি? কিন্তু বিলুর মুখ কেমন যেন কঠিন হয়ে উঠল।

"মড়ির প্রতিদ্বন্দ্বী বাঘমড়ি। মড়িকে দেহবন্ধনে যুক্ত করা যাবে না আর। কিন্তু বাঘমড়ি? তাকে তো দেহবন্ধন থেকে মুক্ত করা যাবে...। তাহলেই তো তারা আবার সমগোত্রের হয়ে উঠবে। বরং তখন বাঘমড়ির ক্ষমতা অনেকটা বেড়ে যাবে। অনেকটা।" পাগলের কথা শুনে চমকে উঠল সুমেশ। আরে তা-ই তো? সে তো এই ব্যাপারটা ভেবেই দেখেনি।

"কিন্তু কীভাবে...? মড়ির উচ্ছিষ্ট তো কালকেই সব জ্বলেপুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছে..." উত্তেজনায় পায়ের গোড়ালি মেঝের ওপর ঠুকতে লাগল অমুয়াটি।

ইশ্! আগে যদি সে জানত...

"উচ্ছিষ্ট কি সব শেষ হয় রে...? খুঁজে দেখ, ঠিক পাবি..."

"চোখের সামনে রয়েছে দাঁড়ায়
চিনতে নাহি পারি
দেখতে ভিন্ন কিন্তু একই
আগলে রাখি বাড়ি।"

ধাঁধার মতো করে কথাটা বলেই বুড়ি তাকাল সুমেশের দিকে। তারপর বাকি দুজনের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোরা যা... আমার ওর সঙ্গে একটু কথা আছে।"

বিলু আর বোবা লোকটি বেরিয়ে যেতেই বুড়ি সুমেশের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল—

"মড়ি মড়ি মড়ি
মড়ার মাথায় নড়ি
নড়ি চাটে নেউল
বিরান হল দেউল
দেউল ভাঙি দাঁতে
মড়ি আসে রাতে
পুনম রাতে আঁধার
মড়ি আসে দুবার
মড়ির প্রথম ছোঁয়া
ছোঁয়ায় বাঁধা নোয়া
ফিরতি মুখের আগে
উঠবে মড়ি জেগে
জাগলে এঁটো মড়া..."

ছড়া আওড়াতে আওড়াতে বুড়িটি আচমকা থমকে যেতেই সুমেশ অবাক হয়ে তাকাল বুড়িটির দিকে। প্রায় অন্ধকার ঘরে টিমটিম করে জ্বলতে-থাকা প্রদীপের মৃদু হলদে আলো বুড়ির আব আর বলিরেখাভরা মুখের ওপর পড়ায় তাকে ভয়ংকর দেখতে লাগছে।

"কী হল? এভাবে থেমে গেলে কেন?"

সুমেশের প্রশ্নে বুড়িটি একটু থেমে খনখনে স্বরে বলে উঠল, "ছড়াটা শেষ

করতে নেই গো...। ছড়াখানা শেষ করতে নেই...। ছড়াখানা শেষ করলেই সে চলে আসে।”

“কে...? কে চলে আসে...?” সুমেশ টের পাচ্ছে, তার গলাটা একটু একটু করে শুকিয়ে আসছে যেন। এই প্রায় অন্ধকার ঘর, ঘরের মধ্যে খাটের ওপর ওই অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে-থাকা এই ভয়ংকরদর্শন বুড়ি, বুড়ির এই খনখনে স্বর, আর একটু আগেই পাঠ-করা এই ছড়া একটু একটু করে সমস্ত সাহস যেন শুষে নিচ্ছে তার ভেতর থেকে।

সুমেশের প্রশ্নে বুড়িটি একবার আবার সেই অদ্ভুত হাসিটা হাসল। গলার ভেতর থেকে গার্গলের মতো সেই ভয়ংকর ঘড়ঘড়ে শব্দ।

“কে আসে? কে আসে?... খিকখিক!! মড়ি গো। মড়ি। মড়ি আসে....। মনে রেখো। এই ছড়া কিন্তু কাজে লাগবে...”

(অন্তিম খণ্ড)

(১)

রক্তবন্ধন

"তাড়াতাড়ি আসুন। আমাদের দেরি করা চলবে না।"

সুমেশ দেখল, বিলু মশাল হাতে খুব দ্রুতপায়ে সামনের দিকে হাঁটছে। তার পিছন পিছন সেই পাগল লোকটি। আর সবার শেষে সুমেশ নিজে।

সুমেশ দ্রুতপায়ে ওদের পিছু নিল, কিন্তু ওরা এতই দ্রুত হাঁটছে যে, ওদের পিছু নিতে গিয়ে সুমেশকে প্রায় ছুটতে হচ্ছে।

"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

সুমেশ পিছন থেকে প্রশ্নটা করে উঠতেই, বিলু ঘাড় না ঘুরিয়ে বলল, "আপনি আপাতত এখন মন্দিরে যাবেন। আমি আর পাগলা আউধুনির ডাঙার দিকে একবার যাব। বুড়ির কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আশপাশে কোনও হাড়ের টুকরো পড়ে থাকবে৷ অন্য মড়িকে কায়াহীন করতে গেলে, কিছু না কিছু উচ্ছিষ্ট তো লাগবেই..."

"ওখানে কি পাওয়া যাবে?" সুমেশের কণ্ঠে হতাশা ঝরে পড়ল, "কাল যা অবস্থা দেখলাম। তারপর..."

"জানি না পাওয়া যাবে কি না। কিন্তু বুড়ি কোনও কথা এমনি এমনি বলে

না। বুড়ি যখন এই কথা বলেছে, নিশ্চয়ই কিছু ভেবেচিন্তেই বলেছে। ওই যে ধাঁধার মতো করে ছড়াটা বলল, ওটাতেই হয়তো উত্তর রয়েছে। এই তুমি জানো, বুড়ি কী বলতে চাইল?" বিলু কথাটা পাগলের উদ্দেশে জিজ্ঞাসা করেই সে মাথা নাড়াল। নাহ্, সে-ও জানে না।

"চোখের সামনে রয়েছে দাঁড়ায়
চিনতে নাহি পারি
দেখতে ভিন্ন কিন্তু একই
আগলে রাখি বাড়ি।"

নিজের মনেই বিড়বিড় করে উঠল সুমেশ।

হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল বিলু, তাই ওর কথায় হাঁপানির ছাপ স্পষ্ট—"যাকে দেখলেন, সে-ই খেমি মা। তার বয়স আমরা কেউ জানি না। সচরাচর আমরা যারা অমুয়া, তারা খুব বেশি ওই বুড়ির কাছে যাই না। ওই বুড়ির নাকি পেটের গোপন কথা টেনে বের করবার ক্ষমতা রয়েছে। কিন্তু বুড়িকে আমরা সকলেই অনেক মানি। ও অনেক কিছু জানে। বিপদে পড়লেই ওর কাছে ছুটে যাই। যদিও বুড়োকে কখনও ওর কাছে যেতে দেখিনি। অবশ্য গিয়ে থাকলেও আমি জানি না।"

"আজ গিয়ে অনেক কিছু জানা গেল।" সুমেশের প্রশ্নে বিলু মাথা নাড়াল, "হ্যাঁ, অনেক কিছু। আপনাকে বুড়ি আলাদা করে কী বলল?"

শেষের প্রশ্ন শুনে কয়েক মুহূর্তের জন্য একটু ভ্যাবাচাকা খেলেও, পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, "সাবধানে থাকতে। আর একটা ছড়া বলল, মড়ি মড়ি মড়ি/ মড়ার মাথায় নড়ি... নামের। বলল, ওই ছাড়াটা জেনে রাখতে। নাকি কাজে লাগবে।"

কথাটা বলল বটে সুমেশ, তবে বিলু বিশ্বাস করল কি না কে জানে। যদিও সুমেশের সেসব কথা ভাববার মোটেও অবকাশ নেই। তার মাথায় তখন অন্য একটি দৃশ্য ঘুরপাক খাচ্ছে, বুড়ি তার দিকে আঙুল তুলে বলছে, "বুড়িকে আগুন দিয়েছিলি তুই না? তোর আগুনেই তো মড়ি মুক্তি পেয়েছে। তাহলে

শুরু যখন তুই করেছিস, শেষও তুই করবি। ওই জিনিসগুলোর সৎকার করতে হবে।"

বুড়ির স্বর এখনও সুমেশের কানে ভাসছে। এমন সময় আচমকা একটা গাছের শিকড়ে হোঁচট খেয়ে সুমেশ সামনের দিকে মুখ থুবড়ে পড়ল। ধপ করে আওয়াজ পেতেই সঙ্গে সঙ্গে থমকে পিছন ঘুরল অমুয়া আর পাগলটি।

"এ কী? পড়ে গেলেন কী করে? সাবধানে আসুন..." খানিকটা অন্য ভাবনায় ছিল বলেই হয়তো সুমেশ হোঁচট খেল। একটা শিকড়ের ওপরে পড়ে, ডান হাতের কনুইয়ের ওপর একটা হালকা ব্যথামতো পেয়েছে সুমেশ। ওদের সাহায্যে কোনওরকমে উঠে দাঁড়াতে গিয়েই ঈষৎ যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল সে...

"সাবধানে আসবেন তো। দেখলেন তো, কী বিপদ বাধালেন..."

"আমি ঠিক আছি। কিন্তু একটা কথা বলুন তো... এত তাড়াহুড়া করছেন কেন? বুড়ি তো আপনাদের সেরকম কিছু..."

আচমকা সুমেশের প্রশ্নে বিলু থমকে দাঁড়াল, "তাড়াহুড়া করছি আপনাদের জন্য..."

"আপনার আর আপনার পরিবারের জন্য।"

"আমাদের জন্য? কেন?"

এক মুহূর্ত থেমে বিলু বলে উঠল, "মড়ি কায়াহীন হয়ে শক্তি পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু পূর্ণশক্তি পায়নি। তার কারণ হলেন আপনি আর আপনার পরিবার। যাঁর দেহ সৎকার হয়েছে, তিনি আপনার রক্তের সম্পর্কের। আপনি তাঁর মুখাগ্নি করবার সঙ্গে সঙ্গেই, তাঁর সঙ্গে রক্তবন্ধনে যুক্ত হয়ে গিয়েছেন। এই রক্তবন্ধন চলবে পরলৌকিক কাজকর্ম শুরু হওয়া পর্যন্ত। সৎকারে দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেও শরীরের পূর্ণ মুক্তি ঘটে পরলৌকিক কাজ সমাধার পর। এখানে তো সকলে আপনাকে একঘরে করে রেখেছে। আপনি শ্রাদ্ধের কাজ করবেন কী করে?"

সুমেশ একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, "আমার এক পূর্বপরিচিত কলকাতার

গঙ্গাঘাটে গিয়ে শ্রাদ্ধের কাজ আমার হয়ে করে দেবেন।"

"তার মানে, হিসেবমতো পরশু দিন।" বিলুর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক রকমের শীতল—"আর কাল আপনাদের নখ-চুল কাটা। তার মানে বুঝতেই পারছেন, রক্তবন্ধন ছিন্ন হওয়ার জন্য আপনার হাতে রয়েছে শুধু আজকের রাতটা। আজ আবার অমাবস্যা। কৃষ্ণপক্ষ আজকেই শেষ। কালকের পর থেকে মড়ির ক্ষমতা কয়েকগুণ বেড়ে যাবে। আর বেড়ে যাওয়ামাত্রই সে সবার প্রথমে আপনার পরিবারকে, তারপর আপনাকে শেষ করবে।"

শেষের কথাগুলো আর সুমেশের কানে ঢুকছে না। তার মানে, মড়ি অন্য কোনও কারণে নয়, এই অশৌচ শেষ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু কোথাও ভুল হচ্ছে... সে তো...

সুমেশের ফ্যাকাশে হয়ে-যাওয়া মুখের দিকে তাকিয়ে বিলু বলে উঠল, "ভয় পাবেন না। আমরা আজ রাতের মধ্যেই উচ্ছিষ্ট কিছু... পেয়ে..."

বিলুকে কথা শেষ না করতে দিয়েই সুমেশ বলে উঠল, "আপনাদের কোথাও ভুল হচ্ছে। মড়ি রক্তবন্ধন ছিন্ন হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল না। হয়তো অন্য কোনও কারণে আমাদের ক্ষতি..."

"এ ছাড়া আর কোনও কারণ নেই... রক্তবন্ধনের জন্যই আপনি... আর আপনার পরিবার এতদিন..."

"আমার সঙ্গে তো নিহারিণী দেবীর কোনও রক্তবন্ধন নেই... কারণ আমার সঙ্গে ওঁর কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই।"

সুমেশ মাটির দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে কথাটা বলে উঠতেই, প্রচণ্ড বিস্ময়ে অমুয়া হাঁ হয়ে গেল—"মানে? আপনি না ওঁর ভাইপো? রক্তের দিক থেকে...।"

"আমি ওঁর ভাইপো নই। আদপে আমি ওঁর কেউই নই...।" কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে একটানে বলে চলল সুমেশ, "আমরা যে নতুন বাড়িতে ভাড়া উঠেছিলাম, সেই বাড়ির আগের মালিক কয়েক মাস আগে ওই বাড়ি বিক্রি করে দিয়েছিলেন আমদের বাড়ির মালিককে। আমরা তখন হন্যে হয়ে

পাওনাদারদের চোখ এড়িয়ে কলকাতায় লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ এ বাড়ি, কাল ও বাড়ি। এ বাড়ির মালিক আমাদের সঙ্গে থাকতেন না। ঠিক এরকম সময়ে একদিন হঠাৎ করে আমাদের বাড়ির ঠিকানায় একটা চিঠি আসে। নিহারিণী মল্লিকের চিঠি। এই বাড়ির পূর্বতন মালিকের নামে। আমি বীথির পরামর্শে ওই চিঠি খুলে পড়ি। আর তাতে বুঝতে পারি, এক মুমূর্ষু অগাধ সম্পত্তি রেখে মরতে বসেছে। আর মরণকালে সে এমন একজনকে নিজের কাছে ডাকছে, যাকে যে কখনও দেখেনি। সে শুধু সেই মানুষের হাতে আগুন পেতে চায়। তার বিনিময়ে তিনি এই সম্পত্তি দিয়ে যেতে চান।"

"আর সেই চিঠি পেয়ে আপনারা সম্পত্তির লোভে পরিচয় গোপন করে এখানে চলে এলেন?" বিলু অমুয়ার কণ্ঠস্বর বরফের মতো শীতল।

সুমেশ একটা মুচকি হাসি হাসল। সেই হাসিতে আনন্দের থেকে বেশি অসহায়তা ছিল—"আমরা যে অবস্থায় পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম... তার চেয়ে এটা অনেক ভালো একটা অপশন ছিল আমাদের জন্য...। অন্তত একটা নিরাপদ..."

কথা বলতে বলতে আচমকা তাকে হাত তুলে থামার ইঙ্গিত দিল বিলু। সুমেশ অবাক হয়ে দেখল, বিলুর মুখটা আচমকাই সাদা হয়ে গেছে। আর সে বড় বড় চোখ করে সুমেশের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, "আপনাকে যে মালাটা দিয়েছিলাম... ওটা কোথায়? কোথায় ওই মালাটা...?"

সুমেশ আঁতকে উঠে দেখল, তার গলায় সত্যি সত্যি মালাটা নেই।

সে অবাক হয়ে যখন বিলুর দিকে তাকাল, ঠিক তখনই পাগল লোকটি নীচ থেকে কী যেন একটা কুড়িয়ে তুলল। সেই লাল সুতোর কাঠের পুঁতির মালাটা, যেটা সুমেশ মাটিতে হোঁচট খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিকড়ের খাঁজে আটকে ছিঁড়ে গিয়েছিল।

"তার মানে..."

সুমেশের মুখটা রক্তশূন্য লাগছে। সেইদিকে তাকিয়ে বিলু বিড়বিড় করে বলে উঠল, "তার মানে... আপনি যা যা বললেন, মড়ি সব জেনে গিয়েছে...। এইমাত্র।"

(২)

মুখোমুখি

আচমকা ঝনঝনে একটা শব্দ হতেই ঘুমটা ভেঙে গেল বীথির। মাথা তুলে দেখল, চিলড্রেন ওয়ার্ডের শেষ মাথার বড় ঘড়িতে রাত দুটো বাজতে যায়। এমনিতে শিশু বিভাগ বলে সব সময় এই ওয়ার্ডে আলো জ্বালা থাকে। কিন্তু দেখা গেল, এই ওয়ার্ডে মাত্র একটা টিউবলাইট জ্বলছে। আর সেটাও ভয়ংকরভাবে দপদপ করছে।

বীথি বিছানার ওপর উঠে বসল। পাশের বেডেই শুয়ে রয়েছে টুপাই। টিউবলাইটের দপদপে আলোয় বীথি দেখতে পেল, সে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে। চিলড্রেন ওয়ার্ড বলে এখানে রোগীদের ভিড়টা একটু কম। এই ডরমিটারিতে খান কুড়ি বেড। তার মধ্যে বড়জোর দশ-বারোটাতে পেশেন্ট রয়েছে। বাকি বেডগুলো খালিই পড়ে রয়েছে। গত কয়েকদিন বীথি রাত্রিবেলা টুপাইয়ের বেডেই ঘুমোচ্ছিল। টুপাইয়ের চেহারা রোগা ছিপছিপে হওয়ায় বীথির কোনও অসুবিধে হয়নি। আজ বিকেলে পাশের বেডটা খালি হয়ে যাওয়ায়, বীথি রাতে সেই বেডেই আশ্রয় নিয়েছে।

বীথি বেডের ওপরে উঠে বসতেই, মাথাটা হঠাৎ করেই ঝিমঝিম করে উঠল। সুমেশ বিকেলবেলা এসেছিল। হাতে যেটুকু টাকা অবশিষ্ট ছিল, সেখান থেকেই কিছু খাবার কিনে দিয়ে গিয়েছিল বীথির জন্য। সুমেশের মুখটা আজ বিকেলে বড় ক্লান্ত লাগছিল। কতদিন ঘুমোয় না কে জানে। চোখের নীচে এই ক-দিনে ভালোই কালি পড়েছে। ইদানীং ওর হাবেভাবেও এক ধরনের দৃঢ়তা এসেছে, যেটা আগে একেবারেই ছিল না।

বীথি খবরে শুনছে, হেমতপুরের অবস্থা নাকি আগের থেকেও খারাপ হচ্ছে। আগে যেখানে একজন নিরুদ্দেশ হত। সেখানে নাকি আজকাল গড়ে তিন-চারজন বিভিন্ন বাড়ি থেকে নিখোঁজ হচ্ছেই। পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও

কোনও সুরাহা করতে পারছে না। কালকে নাকি আবার হেমতপুর থানার নতুন অফিসারসহ তাঁর স্ত্রী নিখোঁজ হয়েছেন। বীথির বুঝতে বাকি থাকেনি, এঁরা সকলেই অপরেশবাবুর কথাই বলছেন। সুমেশ আজ বিকেলে এসে সেই খবরই জানাল। মড়ির ভয় ধীরে ধীরে এই হাসপাতালেও ছড়িয়ে পড়ছে। আজ অনেকেই দেখেছে, বিকেলের পর পেশেন্ট সরিয়ে বাড়ির দিকে রওনা হচ্ছে। হয়তো হাসপাতালকে তাদের নিরাপদ মনে হচ্ছে না।

বীথি বিছানা থেকে নেমে এল। জলতেষ্টা পাচ্ছে। টুপাইয়ের বিছানার পাশে একটা সাইড টেবিল রয়েছে। জলের বোতলটা ওখানেই রাখা ছিল। হাত বাড়িয়ে বোতলটা নিতে গিয়ে বীথি অবাক হল। জলের বোতলটা খালি হল কী করে? ও নিজে ঘুমোনোর আগে জল ভরে এনেছিল।

যাক গে, হয়তো ঘুমের ঘোরে ও-ই কখন উঠে জল খেয়ে শেষ করেছে। ডরমিটারির এক প্রান্তে একটা ওয়াটার পিউরিয়ার রয়েছে। বীথি দেরি না করে সেইদিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু জল নেওয়ার জন্য সুইচটা অন করতে গিয়ে আরেক প্রস্থ বিরক্তির পালা। এ কী? পিউরিফায়ার চলছে না কেন? খারাপ হয়ে গেল নাকি...

মাথার ওপর টিউবলাইটটা এখনও দপদপ করছে। কী জ্বালা রে বাবা! এখন জল কোথায় পায় সে? এদিকে জলতেষ্টা আচমকা এতই বেড়ে গিয়েছে যে, গলাটা শুকনো লাগছে হঠাৎ করেই।

বীথি দেরি না করে ডরমেটোরির বাইরে করিডরে বেরিয়ে এল। নির্জন করিডরে ঝকঝকে আলো জ্বলছে। এই করিডর দিয়ে সোজা বেরিয়ে ডানদিক বরাবর এগিয়ে গেলেই লেডিজ টয়লেট রয়েছে, ওরই পাশে আরেকটা পিউরিফায়ার সে দেখেছে। বীথি দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। টুপাইয়ের যদি ঘুম ভেঙে যায়, আর মা-কে না দেখতে পায়, তাহলে কিন্তু কান্নাকাটি শুরু করে দেবে। ইদানীং টুপাই একটু বেশিই ঘ্যানঘেনে হয়ে যাচ্ছে। যদিও একজন মেট্রনকে সে চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছে, কিন্তু তারপরেও...

আলো জ্বললেও পুরো করিডরটা নির্জন। কড়া ওষুধ আর ফিনাইল-মেশানো

গন্ধ চারদিকে। এই নির্জন করিডরে এই রাতের বেলা একলা চলতে চলতে বীথির বুকটা ছ্যাঁত করে উঠল। হাসপাতাল এমনিতেও তার পছন্দের জায়গা নয়। তার বারবার মনে হয়... হাসপাতালে একটা চূড়ান্ত নেগেটিভ ভাইভস তৈরি হয়, আর সে সেটা নিতে পারে না।

এখানকার ওয়াটার পিউরিফায়ারটা ঠিকঠাক চলছে দেখে বুকে স্বস্তির নিশ্বাস এল তার। সে দ্রুত জলটা বোতলে নিয়ে, কিছুটা ঢকঢক করে খেয়ে নিল। আর তারপর বাকি বোতলটা ভরে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ডরমিটারির দিকে। অন্যদিন সে অনেক রাতেও বেরিয়েছে টয়লেটের জন্য। কিন্তু আজ এই অদ্ভুত অস্বস্তি কেন হচ্ছে তার? কেন তার বারবার মনে হচ্ছে, অত্যন্ত খারাপ কিছু হতে চলছে? নাহ্, সে দেরি করবে না। তাড়াতাড়ি পা চালাল করিডর বরাবর। লম্বা করিডরের শেষ মাথায় টুপাইয়ের ডরমেটোরি। কিন্তু কয়েক পা এগোনোমাত্রই আচমকা দপদপ করে উঠল করিডরের শেষ মাথার আলোটা।

বীথির নিশ্বাস ঘন হচ্ছে। কিন্তু তবুও সে চলা থামাচ্ছে না। এতক্ষণ তো ঠিকঠাকই জ্বলছিল আলোটা, আচমকা কী শুরু হল? কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবনার সময় পেল না সে। দপদপ করতে-থাকা আলোটা আচমকা নিবে যেতেই... থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল বীথি। করিডরের শেষ মাথাটা কী ভয়ংকর কুচকুচে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। বীথির বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করছে... না, সত্যি কিছু ঠিক নেই। তার মন বলছে। কথাটা ভাবতে ভাবতেই বীথি যেই আরেক পা বাড়িয়েছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সামনের আলোটাও দপ করে নিবে গেল।

বীথি টের পাচ্ছে, তার গলার ভেতরটা আবার শুকিয়ে আসছে। ঠিক এমন সময় অন্ধকার করিডরের শেষ প্রান্ত হতে ভেসে এল একটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ। যেন কোনও চাকার ওপরে বসিয়ে ভারী কিছুকে কেউ ঠেলে আনছে। কোনও স্ট্রেচার কি? শব্দটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে বীথির দিকে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র সময়, ধীরে ধীরে বীথি দেখল, আলোর বৃত্তে প্রবেশ করে একটা

হুইলচেয়ার তার থেকে হাত পনেরো দূরে এসেই থেমে গেল। হুইলচেয়ারটিকে দেখেই একটা ভয়ংকর চিৎকার বেরিয়ে এল বীথির গলা চিরে। হুইলচেয়ারটা খালি নেই। একজন বসে আছে সেই হুইলচেয়ারের ওপরে। একটা মেয়ের নগ্ন শরীর। কালো কুঁচ চামড়া। মাথাটা একপাশে হেলানো। মুখ দেখা যাচ্ছে না, কারণ মুখের সামনে পড়ে রয়েছে লম্বা কালো চুল।

বীথি হাতের জলের বোতলটা ছুড়ে ফেলে পিছনদিকে ছুটতে লাগল। পাগলের মতো ছুটছে, আর চিৎকার করছে। "বাঁচাও... বাঁচাও... কে আছ বাঁচাও..."

কিন্তু কেউই এল না। কোন এক মন্ত্রবলে এই হাসপাতাল যেন প্রাণীশূন্য হয়ে গিয়েছে। এই হাসপাতালে জীবন্ত প্রাণী বলতে যেন বেঁচে রয়েছে একমাত্র বীথি... তাকে পালাতে হবে... পালাতে হবে এই হাসপাতাল ছেড়ে...

ছুটছে ছুটছে ছুটছে... কিন্তু নীচের তলার করিডরে এসে, বীথির পা-জোড়া টেনে কেউ যেন মাটির মধ্যে গেঁথে দিল।

করিডরের মাঝের আলোটা দপদপ করছে... আর ঠিক সেই দপদপে আলোর নীচেই উবু হয়ে বসে রয়েছে সেই ভয়ংকরী। মড়ি!

ভয়ে বীথির গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোল না। মাথাটা ভার হয়ে আসছে। এখুনি হয়তো মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে। সে কোনোরকমে পাশের একটা রুমের দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকেই দরজাটা লাগিয়ে দিল। ভয়ংকরভাবে হাঁপাচ্ছে সে... হাঁপানির আওয়াজ যেন না বাইরে চলে যায়। এইজন্য দরজায় ঠেস দিয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে রাখল সে...

কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য। সামনে সে যা দেখল, বীথির মনে হল, তার সারা শরীর যেন অবশ হয়ে আসছে।

সামনে, স্ট্রেচারের ওপর দিয়ে শুয়ে আছে সাদা পলিথিন-ঢাকা সারি সারি মৃতদেহ। সাদা পলিথিনের আড়াল থেকে তাদের ফ্যাকাশে রক্তহীন মুখগুলো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে বীথি। কিন্তু সব ক-টা মৃতদেহের মুখ ওর দিকে ফেরানো... আর প্রত্যেকেই হাসছে। ওর দিকে তাকিয়ে একটা হিমশীতল হাসি

হাসছে। প্রত্যেকেই। আচমকা ঘরের ভেতরের আলোটা দপদপ করে উঠতেই, কে যেন ঠিক কানের পিছনে ফিশফিশ করে বলে উঠল...

"মড়ি মড়ি মড়ি..."

আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মৃতদেহ স্ট্রেচারের ওপর উঠে বসে একসঙ্গে তার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল।

নিজের শরীরে সবটুকু বল জড়ো করে বীথি দরজা খুলে ছুটল মেন দরজার দিকে। পালাতে হবে... পালাতেই হবে তাকে...। বীথি টের পাচ্ছে, বিল্ডিং-এর সব ক-টা আলো দপদপ করছে একসঙ্গে। মাথা ঘোরাচ্ছে তার, পা টলছে। গলা শুকিয়ে আসছে। সে ভেবেই নিয়েছে, সে আর কখনও এখান থেকে বেরোতে পারবে না। আর ঠিক তখনই সে হাসপাতালের লনে নিজেকে আবিষ্কার করল...।

লনে দাঁড়িয়ে কুকুরের মতো হাঁপাচ্ছে সে। ছুটতে ছুটতে সে যে কখন বেরিয়ে এসেছে, খেয়ালই করেনি।

সে পেরেছে... পেরেছে... মড়ির হাত থেকে বেঁচে, বিল্ডিং-এর বাইরে বেরোতে...

"মা..."

আচমকা এই একটি ডাকে তার সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার হয়ে গেল। টুপাই? টুপাই কই? এতক্ষণ সে ভুলেই গিয়েছিল টুপাইয়ের কথা? নিজে বাঁচার তাগিদে... এই অবস্থাতেও লজ্জায় মিশে যেতে ইচ্ছে করল মাটিতে। কেমন মা সে... যে নিজের সন্তানকে ভুলে...

"মা..."

মাথার ওপর থেকে একটা ডাক শুনে চমকে ওপরের দিকে তাকাতেই বীথি টের পেল, একটা শীতল স্রোত ধীরে ধীরে মেরুদণ্ড দিয়ে নীচে নেমে গেল যেন। সারা বিল্ডিং-এর আলো দপদপ করে জ্বললেও, দোতলার বারান্দার একটি আলো স্থির হয়ে জ্বলছে। আর ওই আলোর নীচে বারান্দার রেলিং
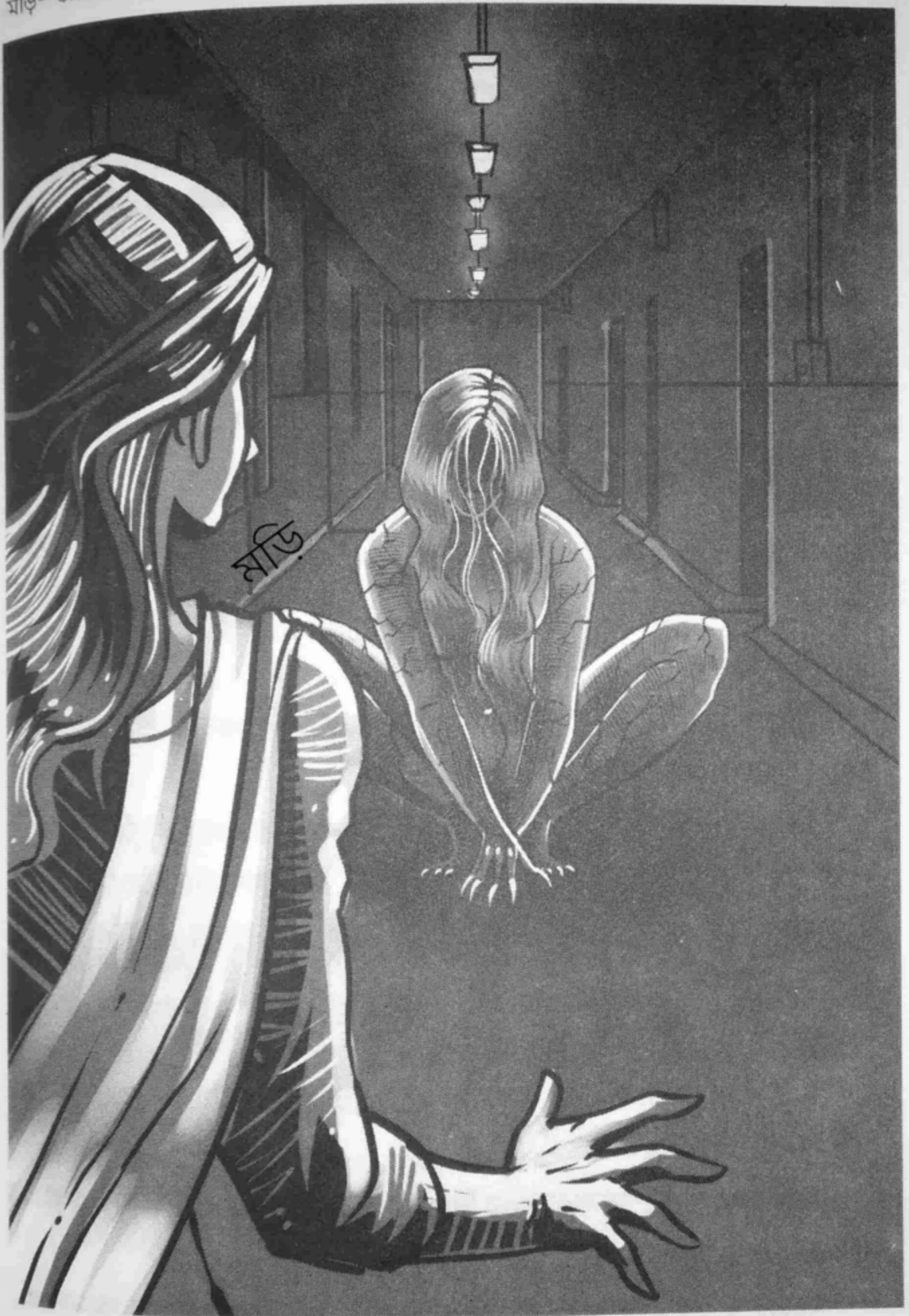
করিডরের মাঝের আলোটা দপদপ করছে... আর ঠিক সেই দপদপে আলোর নীচেই উবু হয়ে বসে রয়েছে সেই ভয়ংকরী।

ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে টুপাই।

বীথি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, টুপাই হাসছে ওর দিকে তাকিয়ে। আচমকা টুপাই বীথির দিকে তাকিয়ে হাত নাড়াতেই বীথি চমকে উঠল। কারণ সে ততক্ষণে দেখতে পেয়ে গিয়েছে যে, একটা চুলে ঢাকা লম্বা শরীর ঠিক টুপাইয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে ওর কাঁধ খামচে ধরল।

বীথি সেইদিকে তাকিয়ে চোখ বন্ধ করল। একটা জোরে শ্বাস নিল। কয়েক মুহূর্ত টুপাই-এর কাছে চুপ করে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে... আবার বিল্ডিং-এর দিকে এগিয়ে গেল।

(৩)

দেহহীন

"এ কী দাদা? বিল্ডিং তো পুরো অন্ধকার...। পাওয়ার শর্টেজ নাকি? হসপিটাল তো এইভাবে..."

বাকি কথাগুলো কানে ঢুকছিল না সুমেশের। তার চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে ঢাকা হসপিটাল বিল্ডিং-এর দিকে। এই গাড়িটিকে সুমেশ পেয়েছে মেন রোডে উঠে। অনেক কষ্টে লিফ্‌ট দিতে রাজি করিয়ে তারপর এখানে আসতে পেরেছে সুমেশ।

সুমেশ দেরি না করে, চটপট গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়াল।

"আপনি না বলছিলেন, আপনার ছেলে এই হসপিটালে ভরতি আছে? কই, এখানে তো তেমন..."

লোকটাকে কথা শেষ করতে না দিয়েই সুমেশ বলে উঠল, "লিফ্‌ট দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ, দাদা। এবার আসুন।"

"আচ্ছা মানুষ তো আপনি? আপনাকে লিফ্‌ট দিয়ে এখানে আনলাম... এতটা উপকার করলাম... আর আপনি?"

ভদ্রলোকের এইসব প্রলাপ শোনার মতো সময় ছিল না সুমেশের। পুরো বিল্ডিং এইভাবে অন্ধকার হওয়ার কথা নয়। তারপর এই কাঠ-পোড়া গন্ধ। সে যা ভয় পেয়েছে তা-ই হয়েছে। মড়ি এখানে পৌঁছে গিয়েছে। লোকটি গাড়িতে বসে তখনও গজগজ করেই চলছিল।

"হ্যাঁ, এরকমই মানুষের ব্যবহার হয়। শালা সবাই বেইমান..."

আর সহ্য করতে না পেরে চিৎকার করে উঠল সুমেশ, "নিজের জীবন যদি বাঁচাতে চান তাহলে এক্ষুনি বেরোন এই জায়গা থেকে... বুঝতে পারছেন না জায়গাটা স্বাভাবিক নয়...?"

সুমেশের চিৎকারে এমন কিছু ছিল, যাতে লোকটি ভয় পেয়ে সেই মুহূর্তে গাড়ি ঘুরিয়ে পগারপার হল। হেডলাইটের আলোটা এতক্ষণ ছিল বলে, জায়গাটা কিছুটা আলোকিত হয়ে ছিল। গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ামাত্রই জায়গাটা গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল। সুমেশ দেরি না করে পকেট থেকে মোবাইলটা বের করে ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা জ্বালাল। তারপর একটা জোরে শ্বাস টেনে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল টুপাইয়ের ডরমিটারির দিকে।

* * * * * * * * * *

দরজার বাইরে থেকেই সুমেশ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে, কেউ যেন ডরমিটারির ভেতর থেকে গুনগুন করে কিছু আওড়ে চলেছে। কিছুক্ষণ কান পেতে সুমেশ বুঝতে পারল, এটা একটা ছড়া। মড়িকে আটকাতে হেমতপুরের লোক যে ছড়া আওড়ায়, সেই ছড়া—

"অসত কালী বসত কালী
কালীর পদে ধরি।
আনমনেতে দিস না সাড়া
আসবে ছুটে মড়ি।।"

কিন্তু এই ছড়া এইখানে শোনাল খানিকটা উপহাসের মতো। সুমেশ নিজেকে ভেতরে ভেতরে শক্ত করল। বুকের ওপরে একটা ভারী পাথরের মতো কিছু একটা চেপে বসেছে। বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে চিতা-পোড়া গন্ধে। এর মধ্যেই সুমেশ একটা জোরে শ্বাস টেনে ডরমিটারির দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল। আর প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই থেমে গেল সেই ছড়া।

মোবাইলের ফ্ল্যাশের আলো সরাসরি গিয়ে পড়ছে সামনের দিকে। আর সেই আলোয় শিশু বিভাগের ভেতরে যা দেখা গেল, তা দেখে সুমেশ কয়েক মুহূর্তের জন্য শ্বাস নিতেই ভুলে গেল।

লম্বা ডরমিটারির মাঝখানের একটি বেড বাদে সব ক-টি বেড শূন্যে ভাসছে। হ্যাঁ, ঠিক শুনেছেন, সব ক-টি বেড মাটি থেকে হাত সাতেক ওপরে শূন্যে ভাসছে। আর মাঝখানে যে বেডটি রয়েছে, সেই বেডটির দু-হাত ওপরে শূন্যে ঝুলছে টুপাইয়ের দেহ। কোমরের দিক থেকে ভাঁজ হওয়া। ঠিক যেন ঘোড়ার নাল। চোখ খোলা, স্থির আর ঘোলাটে। শরীরে প্রাণ আছে কি না বোঝা যাচ্ছে না। আর ঠিক ওই বেডের নীচেই উবু হয়ে বসে রয়েছে বীথি। ন্যাড়া মাথা, চুলগুলো পায়ের চারপাশে ছড়ানো, কামানো মাথায় চাপ চাপ রক্ত। হাতে ধরা এটা অপারেশন নাইফ দেখে বোঝা যায়, নিজেই নিজের মাথা কামিয়েছে। দু-চোখ মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইটের আলোর দিকে নিবদ্ধ, কিন্তু সেই চোখে কোনও তারা নেই, পুরোটাই ঘোলাটে। গায়ের ফরসা চামড়া ধীরে ধীরে কেমন যেন বদলে যাচ্ছে কালো রঙে... হাত-পায়ের নখ পর্যন্ত কালো হয়ে গিয়েছে... মুখ হাঁ করে তাকিয়ে আছে সে আলোর উৎসের দিকে। কী বড় মুখের হাঁ-খানা। সুমেশ এতদূর থেকেও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, জিবের ওপরে দলা দলা রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। বোঝাই যাচ্ছে, ওই সার্জিক্যাল নাইফ দিয়েই জিবটাকে ফালাফালা করেছে সে। বীথির অবস্থা দেখে বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল সুমেশের। একটা কান্নার ঢেউ... গলা ঠেলে বেরিয়ে আসতে গিয়ে কোনওরকমে নিজেকে আটকে নিল সে...

"খুব কান্না পাচ্ছে? খুব কান্না?" আচমকা বীথি কথা বলে উঠতেই বীথির গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে এল জোড়া কণ্ঠস্বর। এক পলক শুনলে মনে হবে, দুজন মানুষ কথা বলছে বীথির ভেতর থেকে...

"মনে ছিল না? এখানে আসার আগে মনে ছিল না? খিক খিক খিক খিক... কী ভেবেছিলি? আমায় শেষ করবি? পারবি? খিক খিক খিক খিক... আমাকে কেউ শেষ করতে পারবে না। কেউ না..."

কথাটা বলেই হাতটা বাড়িয়ে কী একটা ইশারা করতেই, পলকের মধ্যেই শূন্যে উড়ে, সুমেশের শরীরটা আছাড় খেল পাথরের মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে বুকে লাগল বিষম ধাক্কা। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল। সুমেশের যন্ত্রণা দেখে খিলখিল করে হেসে উঠল বীথি ওরফে মড়ি।

কোনওরকমে সেই যন্ত্রণা গিলে, সুমেশ হাঁপাতে হাঁপাতে বলে উঠল, "তোমার যদি কোনও শত্রুতা থেকে থাকে, ওরা তো তোমার কোনও ক্ষতি করেনি... কেন ওদের কষ্ট দিচ্ছ?"

"এমনিই... কষ্ট দিতে ভাল্লাগে। তাই কষ্ট দিই। খিকখিক..." কথাটা বলেই বীথি সজোরে নিজের মাথাটা পাথরের মেঝেতে ঠুকে দিতেই সঙ্গে সঙ্গে কপালের সামনেটা ফেটে গেল। কিন্তু বীথি নির্বিকার। আঁতকে উঠল সুমেশ। মড়ি বীথিকে আঘাত দিতে দিতে শেষ করে দেবে। নাহ্! ওকে থামাতেই হবে।

"আমি তোমায় আবার বলছি। ওদের ছেড়ে দাও, তোমার শত্রুতা আমার সঙ্গে... আ-আমি... তোমায় শেষ করবার কথা ভেবেছিলাম..."

"আমায় শেষ করবি? তুই? তুই শেষ করবি...?" কথাটা বলেই দাঁত কিড়মিড় করে উঠতেই সুমেশের মনে হল, একজোড়া অদৃশ্য হাত তার গলায় চেপে বসেছে। "তোর কী ক্ষমতা? তোকে তো আমি পিষে মারতে পারি।"

সুমেশের মনে হল, সে আর নিশ্বাস নিতে পারছে না। দম বন্ধ হয়ে আসছে...

"আমি শুধু অপেক্ষা করছিলাম রক্তবন্ধন শেষ হওয়ার। সেটাও আজকে নিজের মুখে স্বীকার করে, আমার কাজ আরও সহজ করে দিলি..." কথাটা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আবার একটা ধাক্কা। পাশের দেওয়ালে ধাক্কা লেগে ছিটকে পড়তেই হাত থেকে ফ্ল্যাশলাইটের আলোটা খসে পড়ল।

কোনওরকমে শ্বাস নিতে পেরেই, কেশে উঠল সুমেশ। কাশতে কাশতে গলা দিয়ে দলা দলা থুতু বেরিয়ে এল মেঝেতে।

"নিজেকে দেখ, তুই পারবি আমার সঙ্গে? খিক খিক খিক খিক..." সুমেশ দেখল, কথা বলতে বলতে বীথি তার দিকে এগোচ্ছে হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে।

আচমকা সুমেশ একটু দম দিয়ে বলে উঠল, "আমি পারব না হয়তো। তবে বাঘমড়ি.... সে তো পারবে।"

বাঘমড়ি নাম শুনেই সটান সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল বীথি। সুমেশ বুঝতে পারল, বীথির ভেতরে আশ্রয়-নেওয়া মড়ি এই নাম শুনে ভয় পেয়েছে... কিন্তু সেই ভয় কয়েক ক্ষণের মাত্র।

আচমকা আনন্দে লাফিয়ে উঠে বলল, "বাঘমড়ি আমার কিচ্ছু করতে পারবে না। কিচ্ছু না...। আমি এখন কায়াহীন। আর ও শক্তিহীন। ওর তো কোনও শক্তিই নেই, কারণ আমি সেদিন আউধুনির ডাঙায় সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছি। দেখবি... দেখবি... দেখবি... কার ছদ্মবেশে গিয়েছিলাম সেখানে?" কথাটা বলতে বলতেই, কী যেন একটা হল... আর সঙ্গে সঙ্গে বীথির শরীরটা বদলে গেল একটা পুরুষের চেহারায়...

"সনাতন বাউড়ি?" তাহলে সেদিন ওদের সঙ্গে যে আউধুনির ডাঙায় গিয়েছিল, সে সনাতন বাউড়ি ছিল না? সে আসলে ছিল মড়ি?

"সনাতন বাউড়ি আর ওর বউ তো কবেই মরে গেছে। কেউ টের পায়নি। খিকখিক!"

কথাটা বলেই আবার সনাতন বাউড়ির চেহারা বদলে গেল বীথিতে। "এবার... এবার কী হবে? এবার তো সব এঁটো শেষ..." কথাটা বলেই, মাথার

ওপর দুই হাত তুলে নাচতে লাগল বীথি। কী ভয়ংকর সেই নাচ! কী ভয়ংকর সেই জোড়াকণ্ঠের উল্লাসধ্বনি। আচমকা টানটান হয়ে উঠে দাঁড়াল সুমেশ। ঠোঁট ফেটে রক্ত পড়ছে তার। কপালের একপাশটা ফুলে গিয়েছে। পায়ের হাড় ভেঙেছে কি না, টের পাচ্ছে না সে প্রবল ব্যথায়। বীথির দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে চিৎকার করে উঠল সুমেশ।

"সব কিছু শেষ হয় না, মড়ি। কখনোই সব শেষ হয় না। অনেক বছর আগে, এক ফকিরের করা অপরাধের শাস্তি তার ছেলে আর বউ পেয়েছিল। আজ সেই একই পরিস্থিতি। আমার লোভের জন্যই আজ বীথি আর টুপাইয়ের এই পরিণতি। আমার লোভের জন্য, আমি যদি ঝুঁকি না নিতাম, তাহলে আমার পরিবারকে আজকে এসব ভোগ করতে হত না।" সুমেশ খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে আসছে বীথির দিকে।

"সেদিন ফকির পারেনি তাদের বাঁচাতে। সেদিন মানুষের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা এক-একটা মড়ি তাদের শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু আজ আমি আমার পরিবারকে শেষ হতে দেব না তোর হাতে... কিছুতেই না।" কথা বলতে বলতেই আচমকা সুমেশ বীথির একটা হাতটা ধরল, "দেহহীন হয়ে তুই আমার সামনে মনে করেছিস তুই অপরাজেয় তা-ই না? আমি তো একজন সামান্য দেহধারী মানুষ। আমার এত ক্ষমতা কোথায়? তাহলে এবার চল, সেখানে যাই, যেখানে সমানে সমানে টক্কর হবে..."

কথাটা বলেই সঙ্গে সঙ্গে প্যান্টের মধ্যে গুঁজে-রাখা একটা কাস্তের মতো ধারালো অস্ত্র বের করে আনল সুমেশ। এই সেই অস্ত্র, যেটা বিলুর কোমরে গোঁজা অবস্থায় প্রথম দিন দেখেছিল বীথি আর সুমেশ। ওটা বের করে মুহূর্তের মধ্যে নিজের গলায় আড়াআড়ি চালিয়ে দিল সুমেশ। সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিল বীথিকে। ভয়ংকরভাবে চিৎকার করে উঠল বীথি। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে, হাতের ধারালো অস্ত্রটা মুহূর্তে ছুড়ে, সুমেশ জাপটে ধরল বীথিকে, তারপর এক হাতে গলার ক্ষত চেপে কোনওরকমে বলে উঠল—

"এলান পাথর, বেলান পাথর
পাথর মেরে কানা।
মড়ি তোকে এই ঘরেতে
আসতে করি মানা।"

ব্যাস, তারপরেই আর কিছু মনে রইল না ওদের।

* * * * * * * * * *

চোখ মেলে তাকাতেই, সামনে শুধু ধোঁয়া-ধোঁয়া। এত ধোঁয়া, কিন্তু তার নিশ্বাস নিতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। আচ্ছা, ও কি মরে গিয়েছে? গলায় যেভাবে ও কাটারি বসিয়েছিল, তাতে... আচ্ছা, এটা কোথায়? উঠে বসল সুমেশ। জায়গাটা ভীষণ চেনা-চেনা লাগছে। ওই খুঁটির মতো দেখতে গাছগুলো এর আগে কোথায় যেন দেখেছে...। কোথায় দেখেছে... ওহ্, এ তো সেই আউধুনির ডাঙা। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল সুমেশ। চারদিকে এত ধোঁয়া। যদিও রাত্রি তবুও অন্ধকার নয় চারদিক। মাথার ওপর কমলা রঙের আকাশের একটা লালচে আভা রয়েছে চারদিকে।

আচমকা পিছন থেকে একটা চাপা গর্জন শুনে চমকে উঠল সুমেশ।

ধোঁয়া আর অন্ধকারে ভালো চোখ চলে না। কিন্তু সুমেশ দেখতে পেল, ওর ঠিক হাত পাঁচেক দূরে, সেই উবু হওয়ার ভঙ্গিতে বসে রয়েছে একটা নগ্ন দেহের নারী। যার মুখ দেখা যাচ্ছে না চুলের কারণে। মড়ি ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

"তুই এখানে আমায় নিয়ে এসেছিস?" একটা ঘসঘসে স্বর বেরিয়ে এল সেই নারীর শরীর থেকে।

ঠিক তখনই একটা দৃশ্য সুমেশের চোখের সামনে ভেসে উঠল।

সেই অন্ধকার খেমি মায়ের ঘরের ভেতর। বিলু আর পাগলা বেরিয়ে

যাওয়ার পর খেমি মা ছড়াটা বলেই তাকে বলে উঠলেন, এই ছড়াটা মনে রাখতে হবে। কাজে লাগতে পারে। সুমেশ অবাক হয়ে বলল, "কোথায় কাজে লাগবে এই ছড়া?"

"দেহহীনদের জগতে। মড়িকে ওখানে নিয়ে যেতে হবে তোমাকে। এখানে থাকলে মড়ি জীবিত মানুষদের ক্ষতি করতে পারে। কারণ এখানে ও শক্তিশালী। ওর কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। আর ওখানে নিয়ে গেলেই ও শায়েস্তা হবে।"

"কিন্তু ওকে ওখানে আমি কীভাবে নিয়ে যাব?" সুমেশ অবাক হয়ে প্রশ্নটা করতেই খেমি মা ঈষৎ হাসলেন।

"মড়ি দেহহীন হয়েও এই জগতের প্রতি তার আগ্রহ বেশি। এখানে থাকলে ওর ক্ষুধা মেটে সহজেই। ও কিছুতেই যেতে চাইবে না ওই জগতে। তোমাকে মড়িকে জোর করে ওই জগতে নিয়ে যেতে হবে। নিয়ে যেতে পারলে, তবেই তুমি মড়িকে আটকাতে পারবে।"

"মড়িকে আটকাতে আমি সব করতে পারি। আপনি বলুন, আমায় কী করতে হবে।" সুমেশের কণ্ঠ দৃঢ়।

বুড়ি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমাকে নিজের জীবন দিতে হবে।"

"কী? কী বলছেন কী আপনি?"

"তুমি যতক্ষণ নিজে না দেহহীন হচ্ছ, ততক্ষণ আরেকজন দেহহীনকে কীভাবে নিয়ে যাবে? আর তুমিই বা নিজে দেহহীনদের জগতে ঢুকবে কেমন করে?"

"কিন্তু আমি একজন সাধারণ মানুষ... আমি সেই ভয়ংকরীকে কীভাবে..."

"তুমি বুড়ির কেউ নও, আমি সেটা আগেই জানি। কিন্তু তুমি বুড়ির মুখে আগুন দিয়েছ। একজন রক্তসম্পর্কহীন মানুষ, ভিন্ন গোত্রের বা সমগোত্রের যা-ই হয়ে যাক-না কেন... সে যখন কোনও মানুষের মুখাগ্নি করে, সে রক্তবন্ধনে যুক্ত না হলেও, অন্যরকম শক্তিশালী বন্ধনে যুক্ত হয়। যার ক্ষমতা

অনেক অনেক বেশি। তুমি ইতিমধ্যেই সেই বন্ধনে যুক্ত। এবার তোমার নিজেকে স্বেচ্ছায় শেষ করে দেওয়া, এই যে ত্যাগ—এটাও আরেক শক্তিশালী ক্ষমতা। এই দুই ক্ষমতাই তোমায় যথেষ্ট শক্তিশালী করেছে ওকে দেহহীনদের জগতে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শুধু মাথায় রেখো, মৃত্যুকালে তোমার দেহের রক্ত ওর গায়ে ফেলে ওকে তাড়ানোর যে-কোনও মন্ত্র পড়লেই তুমি ওকে নিয়ে দেহহীনদের জগতে পৌঁছোতে পারবে।"

আচমকা এই দৃশ্যটা চোখের সামনে থেকে সরে গেল মড়ির দাঁত কিড়িমিড়িতে।

"তোকে এখানে না আনলে, তুই বীথিকে মেরে ফেলতিস..." সুমেশের কণ্ঠস্বর অত্যন্ত শীতল।

"ওকে তো মরতেই হবে।" দাঁতে দাঁত ঘষলে যেমন আওয়াজ বেরোয়, মড়ির গলার ভেতর থেকে সেরকমই শব্দ বেরিয়ে এল। "আমাকে এখানে বেশিক্ষণ আটকাতে পারবি না।"

মড়ির কথা শুনে সুমেশ মুচকি হাসল—"আমার বেশিক্ষণ লাগবেও না।" আর ঠিক তারপরেই চিৎকার করে উঠল সেই ছড়া—

"মড়ি মড়ি মড়ি
মড়ার মাথায় নড়ি
নড়ি চাটে নেউল
বিরান হল দেউল
দেউল ভাঙি দাঁতে
মড়ি আসে রাতে।।
পুনম রাতে আঁধার
মড়ি আসে দুবার
মড়ির প্রথম ছোঁয়া
ছোঁয়ায় বাঁধা নোয়া

ফিরতি মুখের আগে
উঠবে মড়ি জেগে
জাগলে এঁটো মড়া
মড়ির হাতে ধরা।”

অন্ধকারেও সুমেশ স্পষ্ট দেখতে পেল, ছড়াটা শোনামাত্রই শিউরে উঠল মড়ি। কারণ ছড়াটা শেষ হওয়ামাত্রই, একটা ভয়ংকর গর্জন শোনা গেল মড়ির ঠিক পিছন থেকে। সুমেশ দেখতে পেল, আচমকাই আউধুনি ডাঙার সমস্ত ধোঁয়া যেন নিমেষেই উবে গিয়েছে। আকাশ হয়ে উঠেছে আরও টকটকে কমলা। চারদিকের অন্ধকার যেন আচমকাই ফিকে হয়ে উঠল সেই কমলা আভায়। আর সেই ফিকে আলোয় দেখা গেল, একটা কালো দেহ অদ্ভুত ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে মড়ির দিকে। সেই ভঙ্গি বড় অদ্ভুত। ঠিক যেন কেউ চক্রাসন করেই এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

“কীভাবে... কীভাবে? বাঘমড়ি, বাঘমড়ি এখানে কীভাবে?”

“তোকে দেহবন্ধনে যুক্ত করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু বাঘমড়িকে তো দেহহীন করা সম্ভব ছিল। এখন থেকে বাঘমড়ি দেহহীন।”

কথাটা শুনেই ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল মড়ি।

“নাহ্, নাহ্... এটা সম্ভব নয়। দেহহীন হতে গেলে বাঘমড়ির এঁটো জ্বালাতে হত। কোথায় পেলি বাঘমড়ির এঁটো? কোথায় পেলি? আমি তো সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিলাম?”

মড়ি প্রশ্নটা করবার সঙ্গে সঙ্গে সুমেশের চোখের সামনে আবার একটি দৃশ্য ফুটে উঠল—অন্ধকার বনের পথ বেয়ে মশাল হাতে ছুটে চলেছে বিলু অমুয়া। তার পিছন পিছন পাগলা আর সুমেশ।

বিলু চিৎকার করছে, “আমাদের তাড়াতাড়ি কিছু না কিছু খুঁজে পেতে হবে। বাঘমড়ির এঁটো সৎকার না করলে আমরা বাঘমড়িকে দেহহীন করতে পারব না কিছুতেই।”

"কিন্তু ওখানে কি আর কিছু পাওয়া যাবে? সব জগড়বৃক্ষ তো জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।" ছুটতে ছুটতেই কথা বলে উঠল সুমেশ। আতঙ্কে তার বুক টিপটিপ করে উঠছে। এখন আবার সেই কাঠের পুঁতির মালা ঝুলছে সুমেশের গলায়। বীথি আর টুপাই হাসপাতালে। সেখানে মড়ি পৌঁছে যাবে যে-কোনও সময়। মড়িকে আটকাতে হলে বাঘমড়ির এঁটো খুঁজে পেতেই হবে।

"অন্তত কিছু গাছ যদি থাকত, যাতে করে..."

সুমেশের কথা শুনে ছুটতে ছুটতে আচমকাই থমকে দাঁড়াল বিলু অমুয়া। তারপর সুমেশের দিকে ফিরে বলল, "কী বললেন? আরেকবার বলুন?"

"বললাম, অন্তত কিছু গাছ যদি থাকত..."

"কিছু গাছ কি সত্যিই নেই? জগড়বৃক্ষ কি আউধুনির ডাঙা ছাড়া আমরা আর কোথাও দেখিনি?"

সুমেশ সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, অমুয়া কী বলতে চাইছে... "কিন্তু ওগুলো কি পুরোপুরি জগড়বৃক্ষ? ওখানে তো পুঁটুলির মতন করে কিছু ঝুলতে দেখিনি।"

"বুড়ি কী বলেছিল, মনে করে দেখুন। চোখের সামনে রয়েছে দাঁড়ায়/ চিনতে নাহি পারি/ দেখতে ভিন্ন কিন্তু একই/ আগলে রাখি বাড়ি। এবার মিলেছে, দেখুন তো?"

চমকে উঠল সুমেশ। আরে, সত্যিই তো...

"যখন কোনও গাছে মড়ির উচ্ছিষ্ট ঠেকানো হয়, ঠিক তখনই সেই গাছের ডালপালা খসে পড়ে। ঘরের যে-কোনও একটি গাছকে জগড়বৃক্ষ বানানোই যায় নির্দিষ্ট উপাচারে।"

"তার মানে বলতে চাইছেন, ওই গাছগুলোতেও বাঘমড়ির উচ্ছিষ্ট রয়েছে?" উত্তেজনায় সুমেশের বুকে কে যেন হাতুড়ির ঘা পিটতে লাগল।

"রয়েছে...। এলাকার জগড়বৃক্ষকে আমরা গাদিতলা বলি।" কথাটা বলেই বিলু পাগলার দিকে ফিরল—"প্রত্যেকটা জগড়বৃক্ষের নীচে, মাটিতে বাঘমড়ির

উচ্ছিষ্ট মড়ার রক্ত-মাখা কাপড় পোঁতা রয়েছে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সব ক-টা নিয়ে এসো।"

বিলুর নির্দেশ পাওয়ামাত্রই, পাগলা সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার বনে হারিয়ে গেল।

"এটা ধরুন।" কথাটা বলেই, বিলু নিজের কোমর থেকে কাটারিখানা বের করে তা বাড়িয়ে দিল সুমেশের দিকে। "আপনার হাসপাতালে যাওয়া উচিত। নিজের পরিবারকে বাঁচাতে একবার শেষ চেষ্টা করা উচিত। আমি জানি না আপনি পারবেন কি না। দেহহীন মড়িকে আটকানো সোজা নয়। যতক্ষণ না নিজে দেহহীন হচ্ছেন, ততক্ষণ মড়ির সম্মুখীন হতে পারবেন না। আশা করি, আমার কথা বুঝতে পেরেছেন... এবার যান, আর দেরি করবেন না। আমার এখানে কিছু কাজ রয়েছে। চিতা জ্বালতে হবে। উচ্ছিষ্টের সৎকার করতে হবে। বাঘমড়িকে দেহহীন করতে হবে..."

দৃশ্যটা সরে গেল মড়ির চিৎকারে। সুমেশ দেখল, বাঘমড়ি মড়ির শরীর বেয়ে ধীরে ধীরে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে। ওদিকে মড়ি যেন নড়তে পারছে না, পাথর হয়ে গিয়েছে।

সুমেশ হেসে বলল, "তোর মূর্খামি তোর কাল হল মড়ি। জগড়বৃক্ষের রহস্য বুঝে তোর আর লাভ নেই... তোর আর মুক্তি নেই, মড়ি। এখন থেকে বাঘমড়িও দেহহীন। সৃষ্টির শেষকাল পর্যন্ত তুই দেহহীন বাঘমড়ির হাতেই আটকা পড়ে থাকবি।"

সে কথা শুনে তীব্র আর্তনাদে চিৎকার করে উঠল মড়ি...। আর ঠিক তখনই বাঘমড়ি একবার মুখ তুলে তাকাল সুমেশের দিকে।

এক মুহূর্তে কী যেন হল, কিন্তু কিছু বুঝে ওঠার আগেই আবার ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে গেল আউধুনির ডাঙা। আর সেই ধোঁয়ায় মিশে হারিয়ে গেল দেহহীন মড়ির আর্তনাদ।

* * * * * * * * * * *

তীব্রগতিতে কলকাতার দিকে ছুটে-চলা এই এক্সপ্রেস ট্রেনের এস-টু কোচটা এই মুহূর্তে প্রায় অন্ধকার। আপার বার্থে শুয়ে শুয়েই ঘাড় বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকাল বীথি। টুপাই মিড্‌ল বার্থে। আর উলটোদিকের একদম নীচের বার্থে অন্ধকার খোলা জানালার বাইরে তাকিয়ে বসে রয়েছে সুমেশ। হ্যাঁ, সুমেশ। সেদিন যখন বীথির জ্ঞান ফিরে এসেছিল হসপিটালে, তখন সকালের মিঠে রোদ ছড়িয়ে পড়েছিল ডরমেটোরিরি আনাচকানাচে। সে অবাক হয়ে দেখেছিল, ডরমিটারির সব কিছুই একদম স্বাভাবিক। বেড, পেশেন্ট, টুপাই একদম স্বাভাবিক অবস্থায়। এমনকি সে নিজেও। বীথি উঠে কয়েক মুহূর্ত ধন্দে ছিল যে, রাতে তার সঙ্গে যা যা হয়েছিল, সেগুলো আদৌ সত্যি ছিল, নাকি সে স্বপ্ন দেখেছিল?

আর ঠিক এমন সময়, আচমকা টুপাইয়ের বিছানার পাশে সুমেশকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চমকে উঠল বীথি। এ কী? সুমেশ? এত সকালে? এখানে কী করে এল? সে প্রশ্নের উত্তর সুমেশের থেকে মেলেনি। ঠিক যেমন করে এই প্রশ্নের উত্তর মেলেনি, যে ওর গলার যে গাঢ় লাল রঙের দাগ হয়েছে, সেটা কীভাবে হয়েছে? সুমেশ আজকাল সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না। নিহারিণী দেবীর পুরো প্রপার্টি বিক্রি করে ওরা কলকাতা ফিরছে। চিরদিনের জন্য। ওদের কোনও আইনি ঝামেলায় পড়তে হয়নি। সেদিনের পর টুপাইয়ের জ্বর কমেছে। আর সেদিনের পর থেকে হেমতপুরে আর মড়ির তাণ্ডব দেখা যায়নি।

আচমকা বীথি ওপর থেকে শুনতে পেল, সুমেশ কী একটা গুনগুন করে গাইছে। বীথি জানে, ও কী গাইছে। ও সেই ছড়াটা সুর করে গাইছে...

মড়ি মড়ি মড়ি

মড়ার মাথায় নড়ি...

এটা সুমেশ গায়। হামেশাই। বলতে গেলে সব সময়। কেন গায়, সেই প্রশ্ন বীথি করেছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, সুমেশ আজকাল সব প্রশ্নের উত্তর দেয় না।

* * * * * * * * * *

"ওরা চলে গেল, খেমি মা।" অন্ধকার ঘরে বসে পাগলা, খেমি মায়ের পা টিপতে টিপতে কথাটা বলে উঠল বিড়বিড় করে। "সব জিনিসপত্র বিক্রি করে।"

"ভালো করেছে।" খেমি মায়ের খনখনে স্বর ছড়িয়ে পড়ল ঘরে।

"সব চেয়ে ভালো হল, দেহহীনদের জগৎ থেকে লোকটা বেঁচে ফিরে এল। এরকম তো সচরাচর হয় না, বলো। এ নিশ্চয়ই বাঘমড়ির দয়া।"

"দয়া?" খেমি মায়ের গলায় একটু উপহাসের সুর।

"তা ছাড়া আবার কী?"

"আসলে যতই হোক, বাঘমড়ি নিজে তো একটা অপশক্তি। সে দয়া করে একজনের প্রাণ ফিরিয়ে দিল, এটা না ঠিক..."

"কেন? ফেরাতে পারে না? তুমি আবার বেশি বেশি ভাবছ। নাও, এবার ঘুমোও তো... অনেকক্ষণ জেগে আছ। অনেক রাত হল।"

"বেশি বেশি ভাবছি বলছিস?" খেমি মা পাগলের কথা শুনে হেসে বলল, "হিঃ হিঃ, তাহলে তা-ই হবে হয়তো।"

সুন্দরবন এলাকায়, বাঘ তার শিকার একবারে খেতে না পারলে রেখে দিয়ে যায় পরে আরেকবার এসে খাবে বলে। বাঘের এই আধ-খাওয়া মৃতদেহকেই বলা হয় মড়ি।

কিন্তু সুন্দরবনের এই তত্ত্ব কীভাবে উত্তর দিনাজপুরের একটি মফঃস্বল শহর হেমতপুরের মানুষের ঘুম কেড়ে নিলো? মড়িক্ষণই বা কী? এই ক্ষণে কেউ মারা গেলে, কেন তার সৎকার করে না হেমতপুরের লোকেরা? বরং তাকে রেখে আসে বাড়ির খোলা ছাদে বা নিভৃত কোনো কোণে!

কেন পশ্চিমের জঙ্গলকে এড়িয়ে চলে এলাকার লোকেরা? অমুয়া—যাদের মুখ দেখা মানেই সর্বনাশ হওয়া। কিন্তু কেন? আর কারাই বা এই অমুয়া?

লোভ! লোভের বশবর্তী হয়ে ভুল করে এমন কাকে মুক্ত করে ফেলেছে সুমেশ আর বীথি?

নিহারিনী দেবীর সৎকারের সময় এমন কী হয়েছিল যার জন্য বদলে গিয়েছিল হেমতপুরের জনজীবন?

অতীতের কোন্ ঘটনা, আজও অভিশাপের মতো জিইয়ে রেখেছে হেমতপুরের এক ভয়ঙ্করীকে? এই অভিশাপ থেকে আদেও কী কখনো মুক্তি পাবে হেতমপুর... নাকি সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত বয়ে যেতে হবে এই অভিশাপের ভার?

ISBN 978-93-90890-38-5

₹ ১৯৯.০০

www.bivapublication.com